স্বর
THE VOICE

A bilingual e- magazine

WOMEN'S History MONTH

MARCH 2024

Issue 3

AN INITIATIVE BY

ICC & GENDER SENSITIZATION COMMITTEE

BARASAT GOVERNMENT COLLEGE

সূচি

PAGE 3
স্বর
PAGE 4
নারী আন্দোলন এবং নারীবাদ
উর্মিতা রায়
PAGE 13
নারীসত্ত্বা
তিতলি সাহা
PAGE 25
বীরাঙ্গনা
সুরভী ঘোষ
PAGE 37
অপরাজিতা
রুকসানা খাতুন
PAGE 45
Yellow in the Blues
ANKANIKA SADHUKHAN
PAGE 49
The Tale of a Wilted Rose and a Letter
SAMADRITA NANDY
PAGE 53
সাতদিন
রূপা সাহা
PAGE 61
জীবনতৃষ্ণা
শুভেচ্ছা মণ্ডল
PAGE 68
বহুরূপী
শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী
PAGE 75
পতিতা আর বিবেক
সৌভিক দাস
PAGE 84
বাঁধন হারা
শ্রীমন্ত ভদ্র (শ্রী চন্দন কুমার বৈদ্য)
PAGE 89
মন চলো নিজ নিকেতনে
শুভ সরকার , সায়নী কুণ্ডু
PAGE 93
প্রতিবাদ
লাবনী সরকার
PAGE 105
স্বীকার
সুপ্রিয়া বারুই
PAGE 114
সাতরঙা
ঐন্দ্রিলা বসু
PAGE 121-122
সৃজন সঙ্গীদের পরিচিতি
PAGE 123-125
ABOUT ICC & GENDER SENSITIZATION COMMITTEE

অধিকার

কারো একার স্বর নয়; বহুর স্বর।
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের মিলিত সাম্যে রচিত মানবমুক্তি।

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি নারী দিবস। কেন?
গৃহশ্রম নারীদের করতেই হয় আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও শ্রমজীবি নারীরা কর্মক্ষেত্রে সচরাচর অদৃশ্যই থেকে যান। অবশ্য এর পেছনে কাজ করছে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাঁদের শ্রমের প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা ও অবহেলা। যেমন, বাংলা বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় যখন আপনি তাঁতি, কৃষক, বাসচালক বা রাজমিস্ত্রিদের কথা বলেন, তখন কি মনে মনে একজন পুরুষের ছবিই এঁকে ফেলেন না? আবার গৃহসহায়িকা, সন্তান প্রতিপালনের কাজে, অসুস্থ মানুষের সেবায় একজন নারীর ছবিই মনে আসে। বাস্তব যেটাই হোক, আমাদের গভীরে যূথবদ্ধ সামাজিক মগ্নচেতনায় পুরুষ ও 'মেয়েদের কাজ' নিয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারণা গেঁথে দেওয়া আছে। আমাদের ভাষার গভীরেই আসলে পেশা নিয়ে লিঙ্গবৈষম্য বহমান।
সমতা ও অধিকার কখনোই ছিল না, এখনও প্রায় নেই ; কোথাও থাকলেও বেশ কম। নারী এখনও সারা পৃথিবীতে অসংগঠিত বৃহত্তম শ্রমজীবী সম্প্রদায়।কর্মক্ষেত্রে এই শ্রেণি ও লিঙ্গবৈষম্য না মুছলে সার্বিকভাবেই ঘুচবে না বৈষম্য। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল বদল জরুরি। প্রতিটি শ্রমজীবি নারীর অধিকার সুনিশ্চিত হোক ; তাই মার্চ মাস নারী ইতিহাস মাস (Women's History Month)।
জাতিসংঘ এবারের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'নারীতে বিনিয়োগ: অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন' ('Invest in women: Accelerate progress) । যার লক্ষ্য সমাজের সকল ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও ক্ষমতায়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। আর তাই এই বছরের প্রচারের থিম 'অন্তর্ভুক্তি অনুপ্রেরণা' (Inspire Inclusion)।

বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের পড়ুয়ারা ছোটো ছোটো নাটক লিখে নারী ইতিহাস মাস উদযাপন করেছে। তাদের সেই আখ্যানে কোথাও আছে কোনো নারীর লড়াই আর সাফল্যের গল্প, কোথাও আছে তাঁদের প্রতিদিনের ভোগ করা বৈষম্য ও হেনস্থার খতিয়ান, কোথাও দানা বেঁধেছে শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, যৌন অভিমুখ (sexual orientation) ভেদে আলাদা আলাদা মেয়ের আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার খণ্ড চিত্র, কোথাও আবার মেয়েদের লড়াইয়ে পুরুষরা শামিল হয়েছে ত্রাতা হিসেবে নয়, সহযোগী হিসেবে...

আসলে সমাজে লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা নিয়ে আমরা অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। সেই সব মুহূর্ত আমাদের অনেক ভাবনার জন্ম দেয়। অনেক প্রশ্ন অনেক খারাপ লাগা বোধ ঘিরে আসে, আবার অনেক মোকাবিলার গল্পও তৈরি হয়। সেই সব ভাবনা নাট্য আকারে রূপ পেয়েছে আমাদের ছাত্রদের কলমে। সেই সকল মৌলিক নাট্যরচনা একমলাটে আনার ইচ্ছাতেই এবারের **স্বর**_এর তৃতীয় সংখ্যার আয়োজন। সঙ্গে থাকলো আমাদের কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ঊর্মিতা রায়ের প্রবন্ধ **নারী আন্দোলন এবং নারীবাদ।**

নারী আন্দোলন এবং নারীবাদ

উর্মিতা রায়

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়, নারীর অবদমিত অবস্থাই স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইওরোপে নবজাগরণের সময় থেকে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

বেশিরভাগ সমাজেই মেয়েরা মা, স্ত্রী বা কন্যা হিসাবে পরিবারে আবদ্ধ থাকার ফলে মহিলাদের সম্পর্কে জানা যেত শুধুমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হলে। নিঃসন্দেহে,সমগ্র ইতিহাস জুড়েই মেয়েরা নিরবিছিন্নভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, কিন্তু ইতিহাসে তাঁরা কখনো দৃষ্টিগোচর হননি।
ফরাসী বিপ্লবের সময়েই প্রথম মেয়েদের সংগঠিতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার কথা জানা যায়। ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিক্ষোভে, মিছিলে মেয়েদের দেখা গেছে। মেয়েরা শুধুমাত্র তাদের পরিবারের মুখে তুলে দিতে খাবারই চায়নি, তারা রাজনৈতিক পরিবর্তনও দাবী করে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব মেয়েদের অধিকারকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয়নি।

নারীবাদের প্রথম ঢেউ

১৯ শতক এবং ২০ শতকের প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য জগতে যে সব নারীবাদী চিন্তা ও আন্দোলন গড়ে উঠে সেগুলিকে সামগ্রিকভাবে নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ বলা হয়। এই পর্যায়ের আন্দোলন দাস প্রথার বিলোপ (ABOLITIONIST) এর জন্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল।

১৮৪৮ সালের SENECA FALLS CONVENTION এর মধ্যে দিয়ে এই পর্যায়ের শুরু হয়, যখন, নারীর সমানাধিকারের দাবিতে ৩০০ জনের একটি বিরাট মিছিল পথে নামে।
এই পর্যায়ে নারীর সমানাধিকারের জন্য বিভিন্ন আইনি দাবী উত্থাপন করা হয়। মেয়েদের রাজনৈতিক ও আইনি অধিকারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রধানত মেয়েদের ভোটাধিকারই ছিল এই পর্যায়ের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয়। মেয়েদের ভোটাধিকার লাভ এই পর্যায়ের আন্দোলনের প্রধান অর্জন।

নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ হল নারীবাদী আন্দোলনের সংগঠিত দ্বিতীয় পর্যায়, যা ১৯৬০ এর দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে ক্রমশ সমগ্র পাশ্চাত্যে এবং বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ বিরোধী, সিভিল রাইট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই পর্বের সূচনা। এই পর্বের আন্দোলন ছিল খুব তীব্র এবং বৈপ্লবিক।

১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালের আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত মিস আমেরিকা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে এর সূচনা হয়। সৌন্দর্য প্রতিযগীতাকে “cattle parade” আখ্যায়িত করে নারীর সৌন্দর্য চর্চাকে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের আত্মীকরণ বলে ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এই মূল্যবোধই মেয়েদের গৃহবন্দী রাখে বা কম বেতনের চাকরিতে আটকে রাখে। ব্রা, প্রসাধনী, উঁচু হিলের জুতোর মতো সামগ্রি, যা মেয়েরা “পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়” হবার জন্য ব্যবহার করে, তা কুড়াদানে নিক্ষেপ করা হয়।

এই পর্বের নারীবাদ বেশ কিছু গুরুতবপূর্ণ তত্ত্ব ও আলোচনা দ্বারা সম্বৃদ্ধ ছিল। Betty Friedan, The Feminine Mystique গ্রন্থটিতে(১৯৬৩) গৃহবধু ও মাতার ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধথাকার কারণে মেয়েদের মধ্যে জমে ওঠা হতাশা ও অসন্তোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Germaine Greer, তাঁর The Female Eunuch (১৯৭০) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, আধুনিক পুরুষতান্ত্রিক ভোগবাদী সমাজ কিভাবে নারীর স্বাভাবিক যৌনতাকে খর্ব করে । পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে ঘৃণা করে ফলে এই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ আত্যস্থ করে নারীও নিজেকে ঘৃণা করতে শেখে। Kate Millett তাঁর Sexual Politics গ্রন্থে বলেন,“Personal is political” অর্থাৎ, ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনীতির অঙ্গ। পরিবারের মধ্যে যে লিঙ্গ বৈশ্যমের সুত্রপাত ঘটে, বৃহত্তর সমাজজীবনে তা পরিব্যাপ্ত থাকে।

এই পর্বে নারীবাদের কর্মকাণ্ডের পরিধি আরও বিস্তার লাভ করে। যৌনতা, পরিবার, কর্মক্ষত্র, প্রজননগত অধিকার, আইনী অসাম্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আন্দোলন হয়। নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ যেখানে রাজনীতি ও আইনী অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদ, সংকৃতির মধ্যে নিহিত নারীর প্রতি বৈশম্য এবং নারী বিদ্বেষের প্রতি সোচ্চার হয়। পরিবেশ নারীবাদী (Ecofeminism) আন্দোলনেরও সূচনা হয় এই পর্বে।

এই পর্বে বেশ কিছু আইনী অধিকারও তারা অর্জন করেছিল, যেমন নিরাপদ গর্ভপাতের জন্য আইন পাশ হয়। পারিবারিক হিংসা, বৈবাহিক ধর্ষণ,ও ধর্ষণ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য আইন পাশ হয়। নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়া মেয়েদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং বিবাহ- বিচ্ছেদ ও সেই সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের দাবী জানান হয়।

ইংল্যান্ডে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের দাবীকে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বিশ্ব যুদ্ধ কালীন সময়ে কর্ম ক্ষেত্রে মেয়েদের পরিসর বাড়তে থাকে। কিন্তু তাদের পুরুষের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। শ্রমিক মেয়েদের সমমজুরীর দাবিতে বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘট পালিত হয়।

নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ

নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই পর্বের সূচনা হয়। উত্তর ঔপনিবেশক (post-colonial) এবং উত্তর আধুনিক(post-modern) চিন্তার দ্বারা এই পর্বের নারীবাদ প্রভাবিত ছিল। এই পর্বের নারীবাদের কেন্দ্রে ছিল বহুত্ববাদ। বিশ্বজনীন নারীত্ব (universal womanhood), শরীর, লিঙ্গ, যৌনতা, বিসমকামিতার স্বাভাবিকতা(heteronormativity) প্রভৃতি ধারণার অবনির্মাণ ঘটে এই পর্যায়ে।
নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গে, নারীবাদীরা লিপ স্টিক, হাই হিল জুতো, যা আগের পর্বে নারীবাদীরা পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের চিহ্ন বলে (কারণ, তা নারী শরীরকে পুরুষের পছন্দমত পরিবর্তন করতে প্রয়াস পায়) বর্জন করেছিল, তা আবার ফিরিয়ে আনে। এই পর্বের তাত্ত্বিকরা মনে করেন নারীর প্রসাধন এবং বুদ্ধিমত্তা একই সাথে থাকতে পারে।
এই পর্যায়ে web বা ইন্টারনেট খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর সাহায্য আন্তর্জাতিক কমিউনিটি গড়ে উঠেছে যেমন Me too.

ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস

নারী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনকে কেন্দ্র করে ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই পর্যায়ে নারী সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী আখ্যানের সাথে যুক্ত। জেমস মিলের মত পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা ভারতের সভ্যতার অগ্রগতী সংক্রান্ত সমালোচনায় নারী সমস্যাকে ব্যবহার করেছেন। ভারতে নারীর দুরবস্থাকে সভ্যতার মাপকাঠিতে ভারতীয় সভ্যতার পশ্চাতপরতার নির্দেশক বলে মনে করা হয়। কাজেই উনিশ শতকের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমাজ সংস্কার পরিকল্পনায় নারী সংক্রান্ত বিষয়টি প্রাধান্য পায়। পাশ্চাত্যের সমালোচনার উত্তরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এক সুবর্ণ অতীতের কল্পনা করেন, যখন নাকি সমাজে নারীর যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাই, সমস্ত ক্ষেত্রে শাস্ত্রের উল্লেখ করে সংস্কারকে বৈধ প্রমাণ করতে দেখা যায়।
রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সতীদাহ প্রথা রদ করেন। পুরুষের বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরব হনএবং নারীর সম্পত্তির অধিকারের পক্ষে আন্দোলন করেন। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেস্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য অক্লান্ত চেস্টা করেছিলেন।

এইভাবে নারী প্রগতি ও আধুনিকতা সংক্রান্ত বিতর্কের অংশহিসেবে নারীশিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। তিনটি গোষ্ঠী এ কাজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন– ব্রিটিশ শাসকবর্গ, ভারতীয় পুরুষ সমাজ সংস্কারক এবং ভারতীয় শিক্ষিত আধুনিক নারী। ভারতীয় শিক্ষিত নারীদের মধ্যে ছিলেন, পশিম ভারতে পণ্ডিতা রমাবাই ও সাবিত্রীবাই ফুলে, মাদ্রাজে ভগিনী শুভলক্ষ্মী এবং বাংলায় বেগম রোকেয়া শেখওয়াত হসেন প্রমুখ।

শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষ, ভিক্টোরীয় আদর্শে সমরুচী সম্পন্ন দাম্পত্যের জন্য নারী শিক্ষা চেয়েছিল। তাই শিক্ষা নারীকে সতী - সাধ্বী স্ত্রী, সুমাতা ও সুগৃহিনীর আর্দশের মধ্যেই সীমায়িত রাখে। এই সব গতানুগতিক ধারণার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কমই শোনা যায়। তারাবাই সিন্দে এবং পন্ডিতা রমাবাই নামে দুজন মারাঠি মহিলা এর ব্যতিক্রম। তারাবাই, ১৮৮২ স্ত্রী পুরুষ তুলনা নামে একটি পুস্তিকা লেখেন, যাতে তিনি সমাজে নারীর অবস্থান ও তাদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এটিকে উনিশ শতকের ভারতে পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গ বৈষম্য ও বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম নারীবাদী প্রতিবাদ মনে করা হয়। পণ্ডিতা রমাবাই শিক্ষিতা অথচ বাধ্য স্ত্রীর আর্দশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনে নারীর আংশ গ্রহণ এবং ভূমিকা সর্বজন গ্রাহ্য লিঙ্গ ভাবাদর্শের দ্বারাই সীমিত ছিল। গৃহস্থলীর কাজকর্মকে নারীর প্রকৃত কাজ বলে মনে করা হত। নারীর আন্দোলনে অংশগ্রহণ সীমিত ছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন, অরন্ধন দিবস পালন, ও কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে প্রতিবাদ জানানোর মধ্যে। কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র অবশ্যই ছিলেন, যেমন সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি বাংলার যুবকদের জন্য শরীর চর্চার সংকৃতি গড়ে তুলে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহিত করেন।

কিছু নারী বৈপ্লবিক আন্দোলনেও যোগ দেন। তবে এঁদের ভূমিকাটি ছিল মূলত পরোক্ষ সমর্থনমূলক, পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া, লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করা, গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও সংবাদ সরবরাহ করা ইত্যাদি। ফলে নারী আচরণের সর্বজন গ্রাহ্য বিধি লঙ্ঘিত হয়নি বা নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনীতিতে দুই প্রভাবশালী নারীর উত্থান ঘটে। থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী অ্যানি বেসান্ত। তিনি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। অন্য জন হলেন সরোজিনী নাইডু। ১৯১৭ সালে তিনি এক প্রতিনিধি দল নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে, লন্ডনে সেক্রেটারি অফ স্টেট মন্টেগুর সাথে দেখা করে মেয়েদের ভোটাধিকার অধিকার দাবী করেন। পরের বছর,তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে নারী পুরুষের সমান ভোটাধিকারের প্রস্তাব দেন। ১৯২৫ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজী আর্বভাবের পরেই শুধুমাত্র মেয়েদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গান্ধীজির আবেদনে সাড়া দিয়ে, হাজার হাজার মেয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯২১ সালে বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী এবং সুনীতি দেবীর কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্যে বিক্ষোভে অংশ নিয়ে, কারাবরণ করে দেশের মানুষকে বিষ্মিত করে দেন। দেশের অন্যান্য অংশেও মেয়েরা অনুরূপ পদক্ষেপ নিয়েছিল। মেয়েদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, গান্ধীর আবেদন প্রান্তিক বর্গের মেয়েদের কাছেও পৌঁছেছিল। প্রচুর যৌন কর্মীরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে যায়। গান্ধীজী তাঁর ডাণ্ডি অভিযানের মূল স্বেচ্ছাসেবী দলে মেয়েদের নিতে চাননি। কিন্তু তিনি তাঁর যাত্রাকালে যেসব সভা করেন, সেখানে হাজার হাজার মেয়ে যোগ দেন। আন্দোলন শুরু হলে, হাজার হাজার মেয়ে আইন অমান্য করে বেআইনি লবণ তৈরিতে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁরা দলে দলে মিছিলে যোগ দেন, বিদেশি কাপড়ের দোকানের সামনে এবং মদের দোকানের সমনে পিকেটিং করেন। মেয়েদের অংশগ্রহণের দিক দিয়ে বোম্বাইয়ের আন্দোলন ছিল সব চাইতে সংগঠিত এবং বাংলার আন্দোলন ছিল সবচেয়ে উগ্র। উত্তর ভারতে এলাহাবাদ, লখনউ, দিল্লি ও লাহোরের মতো শহরে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শত শত মহিলা রক্ষণশীল সমাজকে স্তম্ভিত করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে প্রকাশ্যে পথে নেমে ছিলেন।

বাংলায়, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, কল্পনা দত্ত যোশীর মত কিছু মেয়ে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই পর্বের তাঁদের অংশগ্রহণ আর আগের স্বদেশী আন্দোলনের মতো শুধুমাত্র পরোক্ষ সমর্থনের পর্যায়ে রইল না, বৃটিশ গর্ভনরকে লক্ষ্য করে তাঁরা গুলিও করেন।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেয়েদের সক্রিয় ভূমকা খুবই উল্লেখযোগ্য। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শুরুতেই কংগ্রেসের প্রথম সারীর সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে কিছু মহিলানেত্রী পুলিশি অত্যাচারের মুখ আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। সুচেতা কৃপালানি অহিংস প্রতিরোধ সংগঠিত করেন। গোপন বৈপ্লবিক কাজকর্মের নেতৃত্ব দেন আরুণা আসফ আলী। এই আন্দোলনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে, বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মহিলারা এই উদ্যোগে অংশ নেন।

ভারতীয় নারীদের সামরিক কাজে নামাবার এক পরীক্ষামুলক উদ্যোগ নেন সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯৪৩ সালে তিনি যখন প্রবাসী সেনাদের নিয়ে দক্ষীণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী বা INDIAN NATIONAL ARMY গঠন করেন তখন তিনি এই বাহিনীর সাথে রানী ঝান্সি রেজিমেন্ট নামে এক নারীবাহিনীও যুক্ত করেছিলেন। এখানে জাতি, ধর্ম, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় পরিবারের প্রায় ১৫০০ মহিলা যোগ দেয়।

১৯৪৬ সালের বাংলার তেভাগা আন্দোলনে মেয়েদের যোগদান আন্দোলনটিকে এক নতুন মাত্রা দেয়। এই আন্দোলনে দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নিজেরা নারীবাহিনী গঠন করে হাতের কাছে যা অস্ত্র পায় তাই নিয়েই বৃটিশ পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যদিও এই অসম যুদ্ধে অনেক মেয়েরই প্রাণ যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা আন্দোলনেও নিজাম ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে, মেয়েরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল।

স্বাধীনতার পর ভারতে নারী আন্দোলন

দেশ স্বাধীন হবার প্রধানকাজ ছিল মেয়েদের জন্য প্রতিশ্রুত আইনী এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করা। ভারতীয় সংবিধান নারীকে পূর্ণ সাম্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। নারী, শিক্ষা-সম্পত্তি-আয় নির্বিশেষে ভোট দানের অধিকার লাভ করে।

স্বাধীনতার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল ১৯৭৩-৭৪ সালে কমিনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মূল্যবৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলন। মহারাষ্ট্রের শহরাঞ্চলের হাজার হাজার গৃহবধু পথে নেমে মিছিল করেন। এই আন্দোলন পাশের গুজরাট রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তা মিশে যায় জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্পূর্ণ ক্রান্তি প্রভাবিত নবর্নির্মাণ আন্দোলনের সঙ্গে। সরাসরি নারী বিষয়ক কোন সমস্য নিয়ে আন্দোলন না করলেও মেয়েরা ব্যাপক সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এর প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালের নারী আন্দোলনের উপর। মেয়েদের রাজনীতিকরণ ঘটে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় একটি আন্দোলন হয়। প্রথম দিকে এর নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীবাদী সর্বদয় কর্মীরা,পরে এর নেতৃত্ব যায় মাওবাদীদের হাতে। ভিল উপজাতীর মেয়েরা এই আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছিল। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল খরা ত্রাণ ও জমির দাবীতে। পরে এই আন্দোলন মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। পুরুষের মদ্যপানকেই গার্হস্থ্য হিংসার প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করে মেয়েরা। এই আন্দোলন খুবই জঙ্গি হয়ে উঠেছিল। মেয়েরা দল বেঁধে মদের ঠেক আক্রমণ করে মদ তৈরির হাঁড়ি ভেঙ্গে দিত। যে সব পুরুষ স্ত্রীকে মারধর করে তাদের প্রকাশ্যে সাজা দেবার জন্য মিছিল করে এবং মদ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা দাবী করে।

১৯৭৪ সালে উত্তরাখণ্ডের মহিলাদের পরিচালিত চিপকো আন্দোলন ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন। এটিকে পরিবেশ রক্ষার জন্য ভারতের প্রথম আন্দোলন বলা যায়। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে অহিংস। গাছকে জড়িয়ে ধরে মেয়েরা গাছ কাটা বন্ধ করেছিল বলে এই আন্দোলনের নাম হয় চিপকো আন্দোলন। এখান থেকে এক ধরনের উপলব্ধি জন্মায় যে প্রকৃতিকে লালন করার ক্ষেত্রে মেয়েদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও নারী সমস্যার মধ্যে এক নীবিড় যোগ রয়েছে। পরিবেশ নষ্ট হলে মেয়েরাই সব চাইতে বেশি বিপর্যস্ত হয়। জ্বালানি সংগ্রহ করা,গবাদী পশুর জন্য জাব সংগ্রহ করা, জল আনার মত কাজ মেয়েদেরই করতে হয়, তাই অরণ্য ধবংস হলে, জলাশয় শুকিয়ে গেলে মাইলের পর মাইল হেঁটে এসব সংগ্রহ করে আনতে তাদের চূড়ান্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে ECO FEMINIST বন্দনা শিবার (১৯৮৮) মত প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হল পুরুষতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক, পাশ্চাত্য প্রকল্প যা সহজাতভাবে হিংস্র, এবং একই সাথে নারী ও প্রকৃতিকে শোষণ করে। প্রগতীর এই মডেল সনাতন ভারতীয় ধারনার থেকে অনেক আলাদা, কারণ ভারতীয় চিন্তায় প্রকৃতি এবং নারীকে সৃজনশীল শক্তি ও প্রাণের উৎস মনে করে শ্রদ্ধা করা হয়।ভারতে নারী আন্দোলনের একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়,যখন, নারীবর্ষ (১৯৭৫) উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘ ভারত সরকারকে ভারতে নারীর অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে অনুরোধ করে এবং ১৯৭১ সালে, ভারত সরকারের MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE, এই কাজের জন্য COMMITTEE ON THE STATUS OF WOMEN IN INDIA (CSWI) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৭৪ সালে এই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। এর নাম ছিল TOWARDS EQUALITY REPORT এই রিপোর্ট।

দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংকৃতিক স্তরে, নারীর প্রতি বৈষম্যগুলির উপর আলোকপাত করে সমগ্র দেশে নারীর অবস্থার একমর্মান্তিক ছবি তুলে ধরে। ফলে, এটি প্রকাশিত হবার পর, সরকার, একাদেমিয়া এবং নারী সংগঠনগুলির সামনে ভারতীয় নারীর সমস্যাগুলি নতুন করে উত্থাপিত হয়।

রিপোর্টে দেখা যায়, দেশে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অনেক কম। শিশুকন্যার আসুস্থতার হার ও মৃত্যুহার খুব বেশি, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারী খুবই পিছিয়ে, এবং বৈষম্যপূর্ণ আইন সমাজে মেয়েদের অবস্থা মর্মান্তিক করে তুলেছে। রিপোর্টে এই সব সমস্যার সমাধান হিসাবে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণ প্রথার মত কুপ্রথাগুলির বিলোপ সাধন, মেয়েদের কাজের জন্য সুস্থ পরিবেশের ব্যবস্থা করা, কর্মরত মায়েদের জন্যে ক্রেশ এর ব্যবস্থা করা, মাতৃকালীন সুযোগ সুবিধা দেওয়া, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়। এছাড়া কিছু আইনি সংস্কারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া সম্মান রক্ষার জন্য হত্যা, কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলে।

অন্য যে বিষয়টি নিয়ে ব্যপক প্রচার আভিযান চলে সেটি হল ধর্ষণ। বিশেষ করে পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্র হয়। ১৯৭৮ সালের হায়দ্রাবাদের রামিজা বীর মামলা, ১৯৮০ সালের মহারাষ্ট্রের মথুরা মামলা ও উত্তর প্রদেশের মায়া ত্যাগীর মামলাকে ঘিরে বড় আকারে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৮০ সালেই ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে বিল আনা হয়। ১৯৮৩ সালে আইনটি সংশোধিত হয়ে আসে। আইনটিতে মূল যে পরিবর্তনটি আনা হয়,তা হল যে পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণ অনেক বেশি গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং প্রমাণের দায় ধর্ষিতের বদলে অভিযুক্তের উপর বর্তাবে। এর ফলে অভিযুক্তের দোষী প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। দিল্লির নির্ভয়া ধর্ষণ কাণ্ডের পরও আবার ২০১৩ সালেধ র্ষণ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন হয়।

কিন্তু, শীঘ্রই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে শুধু আইন করে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের সুরক্ষিত গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত আইনকে কাজে লাগিয়ে অবাধে কন্যাভ্রুণ হত্যা করা হতে থাকে। এর প্রতিবাদে আন্দোলন ও প্রচারের ফলে ২০০২ সালে জন্মের পূর্বে লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এর থেকে এ বোঝা যায় যে শুধু আইন প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নয়। আইন সম্পর্কে মেয়েদের সচেতন করা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, , সমাজে লিঙ্গ রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার মাধ্যমকে সংবেদনশীল করা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অন্যথা আইন পুরুষতান্ত্রিক ধাঁচাকেই আরও মজবুত করবে। এই উদ্দেশ্যগুলিকে মনে রেখে নারীবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হয় এবং হায়দ্রাবাদের অন্বেষী, মুম্বাইয়ের TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES এর মতো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সব সংস্থাগুলিতে নারী জীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে গবেষণা হতে থাকে। দেখা যায় যে ৭০ ও ৮০ দশকে তৈরি আইনে অনেক ফাঁক রয়েছে। এর ফলে আবার আইনি সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে। PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT ২০০৫, PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT AT WORK PLACE ACT ২০১৩, প্রভৃতি আইন প্রণয়ন করা হয়। মেয়েদের রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ বাড়াতে ৭৩তম ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীতে পঞ্চায়েত ও নগরপালিকায় ৩৩% আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। সংসদে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের। মেয়েদের জন্যে আসন সংরক্ষণ নিয়ে বিলটি প্রথম সংসদে তোলা হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। শেষ অবধি ২০২৩ সালে সংসদের এক তৃতীয়াংশ আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান দিয়ে ঐতিহাসিক বিলটি পাস হয়। ভারতে নারী আন্দোলনের একটি সীমাবদ্ধতা হল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা উঁচু জাতি এবং উচ্চবর্গের সমস্যা ও অধিকার রক্ষার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। গোপাল গুরু ও শর্মিলা রেগে দলিত নারীর সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই, দলিত নারীর সমস্যা আরও তীব্র ও গভীর। দলিত মেয়েরা একাধারে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতন্ত্র ও দলিত পুরুষের শোষণের শিকার। শর্মিলা রেগে দলিত দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার নিরিখে নারী সমস্যাকে ব্যাখা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

১৯৯০ এর দশকের আর একটি গুরুতবপূর্ণ আন্দোলন হল LGBT সম্প্রদায়ের আন্দোলন, যার মধ্যে দিয়ে NON-NORMATIVE বা নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন যৌনতার মানুষদের জন্য একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংকৃতিক পরিসর ও পরিচিতি খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। সমকামী, রূপান্তরকামী মানুষও পুরুষতন্ত্রের অবদমনের শিকার, তাই তাদের কণ্ঠস্বরও এখানে ধ্বনিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে নারীবাদী আন্দোলনে বহুত্ববাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্বজনীন নারীত্ব (UNIVERSAL WOMANHOOD), শরীর, লিঙ্গ, যৌনতা, প্রভৃতি ধারনার অবনির্মাণ ঘটেছে। তাই এই পর্যায়ের নারী আন্দোলনে এই সমস্ত প্রান্তিক গোষ্ঠীও, জায়গা করে নিয়েছে। মতের ভিন্নতা, ভাবনার বৈচিত্র্য, আন্দোলনকে দুর্বল করেনি, বরং সমৃদ্ধ,পরিমার্জিত ও সংবেদনশীল করেছে।

নাটক

নারীসত্ত্বা

তিতলি সাহা

চরিত্র

[কেন্দ্রীয় চরিত্র লক্ষ্মী, আরো কিছু পার্শ্ব চরিত্র শিবানী, চুমকি এবং মৈথিলী। এছাড়াও কিছু নারী ও পুরুষ চরিত্র রয়েছে]

[সকাল বেলার লোকাল ট্রেন। ভিড়ে ঠাসা জেনারেল কামরা। পর্দা উঠলে দেখা যাবে একটি বেঞ্চের উপর ৩ জন বসে রয়েছে। বাঁ দিক থেকে লক্ষীর প্রবেশ]

১ম ব্যক্তি: হাতে কিছু খুচরো পয়সা (কপালে হাত ঠেকিয়ে) এই নাও তো। এইবার খান্ত দাও। তখন থেকে কানের কাছে তালি দিয়ে দিয়ে মাথায় তো যন্ত্রণা ধরিয়ে দিলে।

লক্ষ্মী: তো কি করবো বলো তো? তখন থেকে ডাকছি কিগো কিছু দেবে? দু পাঁচ টাকা যাহয় দিয়ে যাও। কথা তো কানেই নিলে না। তাই কানের ধারে তালিটা মারতেই হলো।

২য় ব্যক্তি: এই হয়েছে এক জ্বালা। সকাল বিকাল ট্রেনে চাপলেই যত উৎপাত। শান্তিতে যে চোখটা একটু বুজে রাখবো সেই উপায় ও নেই।

৩য় ব্যক্তি: (সামনের দিকে দেখিয়ে) এই তোমার পয়সা পেয়ে গেছো? যাও এবার ওই দিকে যাও তো।

লক্ষ্মী: সব আর পেলাম কোথায় সোনা। এখনও তো তুমি কিছু দিলেই না।

৩য় ব্যক্তি: আমার কাছে আজকে কিছু সুবিধা হবে না। ঐ যে উনি দিলো। তুমি যাও তো এবার।

লক্ষ্মী: যাচ্ছি গো যাচ্ছি। এমন করে বলছো যেন তোমার সঙ্গে এখানে ঘর পাতাতে এসেছি আমি।

৩য় ব্যক্তি: ঘর পাতাতে হলে পুরো মেয়েছেলে হতে হয়। হাফ মেয়েছেলে হলে হবে কি করে।

(তৃতীয় ব্যক্তির কথাটা শুনেও উত্তর দিতে না পেরে না শোনার ভান করে লক্ষ্মী সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সামনে কলেজ ফেরত মেয়েদের একটা দল)

লক্ষ্মী: (মাথায় হাত রেখে) করে মামনিরা? দু পাঁচ টাকা দিয়ে যা।

১ম মেয়ে: দাঁড়াও দেখছি।

লক্ষ্মী: (বাঁ দিকে ঘুরে) করে তোরাও দে কিছু।
২য় মেয়ে: (হেসে) আজকে ছেড়ে দাও দিদি। ও তো দিচ্ছে। আমি পরের দিন দেবো। আমরা এক সঙ্গেই আছি।

লক্ষ্মী: ঠিক আছে। শোন আজকে যেমন তুই হেসে উত্তর দিলি তেমন করেই উত্তর দিবি। কত লোক তো টাকা দিলেও মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখে। বুঝলি?

২য় মেয়ে: হ্যাঁ ঠিক আছে।

১ম মেয়ে: (দশ টাকার নোট দিয়ে) এই নাও।

লক্ষ্মী: (ওই দলের সব কটি মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে করতে) শোন তোরা মন দিয়ে পড়াশুনা করিস। আমাদের তো আর হলো না…

(মেয়েগুলো প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে আকটু হাসলো)

(পিছন থেকে শিবানী)

শিবানী: আরে অ্যাই লক্ষ্মী। তুই শালী সেই তখন থেকে মেয়ে গুলোর সঙ্গে গল্পঃ করছিস। ওই দিকে স্টেশন ঢুকে যাচ্ছে। লোকজন নেমে যাবে তো।

লক্ষ্মী: আরে দাঁড়া তো ….. যাচ্ছি…..

(বলতে বলতেই ট্রেনের চাকা স্টেশন এ থেমে গেল। লক্ষী আর শিবানী নেমে গেল… ধীরে ধীরে ভিড়ে মিশে গেলো।এতক্ষণ বসে বসে পুরো বিষয়টা দেখছিলেন এক স্কুল শিক্ষিকা মৈথিলী গুহ। আজ কয়েক বছর ধরে তিনি এই
তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে যারা পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে পড়াশুনা শিখিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ করে তারা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বস্তি এলাকা। তৃতীয় লিঙ্গের কয়েকজন মানুষ এইখানেই একসঙ্গে থাকে। বস্তির একটি ঘর। ঘরের মাঝে একটা চৌকি। বা দিকে একটা টেবিল। তার উপরই সমস্ত জামাকাপড় রাখা। ডান দিকের দেয়ালে দেবতার ছবি]

লক্ষ্মী: (নোট গুনতে গুনতে) এক.. দুই…. তিন..
বাহ্ আজকে ধান্দা ঠিকঠাক।
কিরে তোর কি অবস্থা?

শিবানী: আমার খুব একটা ভালো হয়নি। আমি তো আর তোর মতো লোকের গায়ে ঢোলে পড়তে পারিনা । তুই কর ধান্দা ভালো করে। আমার হবে না।

লক্ষ্মী: তুই না শালী এক নম্বরের হিংসুটি মেয়েছেলে….

শিবানী: (চায়ে চুমুক দিতে দিতে) হ্যাঁ শালী কুত্তী আমিই তো হিংসুটি…., আর তুই তো সতী না?

লক্ষ্মী: এই তুই যা তো চোখের সামনে দিয়ে…

শিবানী: হ্যাঁ আমি তো যাবই। তুই তো আবার বিদ্যাধরী হিজড়া রে… তোর সঙ্গে আমারে কি মানায় নাকি…?

লক্ষ্মী: দেখ ফালতু বকিস না তো…

শিবানী: ফালতু আমি বকছি না তুইও জানিস... রোজ রাত্তিরে ঢং করে মুখের উপর বই নিয়ে বসিস সেই কি আমি দেখিনি ভাবছিস?

লক্ষ্মী: (একটু উদাস ভাবে) যখন বাপ মায়ের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছি তখন কি আর জানতাম আমি অন্য রকম ? তাই আর পাঁচ জনের মতোই আমিও পড়ালেখা শিখেছিলাম... পরে আস্তে আস্তে যখন সব জানাজানি হলো তখন তো এখানে ফেলে দিয়ে চলে গেল। অভ্যাসটা পুরো যায়নি..তাই মাঝে মাঝে একটু দেখি...

শিবানী: দেখ ফাও বলিস না তো ... তুই যে নিজেরে আমাদের দিয়ে আলাদা ভাবিস সে কি আমি বুঝি না ভাবিস..

লক্ষ্মী: শোন তুই আমারে হিংসা করিস আমি জানি... কিন্তু আমি ভুলে যাইনি যে আমি হিজড়া...

শিবানী: (ব্যঙ্গ করে) হ্যাঁ কত মনে রেখেছিস সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তো অত যখন শখ তো আরো বিদ্যাধরী হলেই পারিস। তোর তো কত সময়...কত বুদ্ধি...

লক্ষ্মী: দুবেলা খাবার জোটাতে জীবন শেষ হয়ে গেল... না আছে টাকা না আছে সেই পড়ালেখা করার অবস্থা.. .. তুই ভাবিস না বুঝলি.. আমি যেমন ভাবতাম ওরকম বড়ো কিছু কখনোই আর হতে পারবো না।

(চুমকির প্রবেশ)

চুমকি: হ্যাঁ রে ? কি শুরু করেছিস বলতো তোরা দুটো ? সেই চায়ের ঠেক থেকে দুটোর গলার আওয়াজ আসছে। কুত্তার মত চেচাচ্ছিস!

শিবানী: ওই এলেন আরেক মাষ্টারনী।

চুমকি: এইসব ফালতু কথা রেখে কাজের কথা টা শোন... বড়ো গলির দিকে শিবুর দোকানের ওখানে একটা বাড়িতে মেয়ের বিয়ে আছে.. টাকা চাইতে যেতে হবে..

লক্ষ্মী: হ্যাঁ আমিও শুনেছি... কখন যাবি?

চুমকি: কালকে সকালেই যাবো... তো গতর টা নাড়িয়ে একটু উঠে যেও সকাল সকাল... সব তো সাহেবের বেটি কিনা বস্তিতে...

শিবানী: হ্যাঁ সে হয়ে যাবে... ওরে নিয়ে যাস .. ও ভালো ঢোলে পড়তে জানে.. শিক্ষিত হিজড়া কিনা..
(শিবানী আর চুমকি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে)

তৃতীয় দৃশ্য

(সকাল বেলা… গৃহস্থের বাড়ি… আসন্ন বিয়ের প্রস্তুতি চলছে কিছু কিছু । উঠোনে কনের দাদা কে প্রথম দেখা যাবে। লক্ষ্মী, শিবানী, চুমকি সহ আরো দুজনের প্রবেশ)

লক্ষ্মী: (হাতে তালি দিয়ে) অ্যাই যে ছোকরা..তোদের বাড়িতে নাকি মেয়ের বিয়ে?

দাদা: (একটু অবাক হয়ে) ওহ আপনারা! হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আমার বোনের বিয়ে।

চুমকি: হ্যাঁ বাবা সেই শুনেই তো এসেছি। কথা আছে ।

দাদা: ওহ আচ্ছা। দাঁড়ান বাবা কে ডাকছি। অনেকেই বলুন কি বলবেন।

চুমকি: হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক ডাক।

দাদা: (পিছনে ফিরে) মা…… ও মা…. বাবাকে ডাকো তো … দেখো ওনারা এসেছেন। কিসব কথা আছে..

(পিছন থেকে মায়ের প্রবেশ আঁচলে হাত মুছতে মুছতে)

মা: কিরে কে এসেছে এই এতো সকালে?
(সবাইকে দেখে)
ওহ ওনারা এসেছেন। দাঁড়া তোর বাবাকে ডাকি।
(ভিতরে প্রবেশ করতে করতে)
কি গো শুনছো….? যাও বাইরে গিয়ে দেখো তো.. একটু কথা বলে এসো… কি বলে তাই দেখো গিয়ে এখন…(একটু শঙ্কিত হয়ে) কত টাকা আবার চাইবে কি জানি বাবা…

বাবা: আরে দাঁড়াও তো.. আগে গিয়ে কথা বলি.. আগেই এত ভুলভাল বলো না তুমি..

দাদা: এই দেখো বাবা … ওনারা এসেছেন… তাই ডাকছিলাম…
বাবা: হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি দাড়া..
(উঠোনে নেমে এসে সকলের দিকে তাকিয়ে)
হ্যাঁ বলো দেখি কি বলবে তোমরা?

লক্ষ্মী: বলছি কি কাকু আপনার তো মেয়ের বিয়ে তা আমাদের টাকার ব্যাপার টা তো জানেন আপনারা…. তো কত কি দিচ্ছেন আর কি শুনতে এলাম…

বাবা: দেখো এতো আমি জানি যে তোমাদের টাকা পয়সা দিতে হয়… কিন্তু….

শিবানী: ওসব কিন্তু কিন্তু করে কিছু হবে না… এটা আমাদের হকের টাকা … সবাই দেয়.. কত কি দেবে সেটাই কথা…

চুমকি: কত কি দেবে আবার কি রে ? মন্দার বাজার.., দশ হাজারের এর এক টাকাও কম হলে হবে না।

(সবাই একসাথে সম্মতি সূচক কথা বলবে)

বাবা: (কিছুটা বিচলিত ভাবে) না না আমার পক্ষে এতো টাকা হবেই না মা…একটু বোঝো আমার দিক টা.. দেখতেই তো পাচ্ছো আমার অবস্থা…

শিবানী: (একটু রেগে) এই তো কাকু.. সব ঠিক আছে শুধু হিজড়ে রা টাকা চাইলেই আপনাদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়..

বাবা: (একটু করুনভাবে) না না সেটা না.. সবই তো দেখতেই পাচ্ছো বলো আমার অবস্থা…

লক্ষ্মী: হ্যাঁ সে ঠিক আছে.. তো কম সম করে কি দিতে পারবে সেটাই বলো..
বাবা: আমি পারবই না মা .. তোমরা বরং এক কাজ করো.. বিয়ের দিন তোমরা এসো… নিমন্ত্রণ থাকলো তোমাদের…

শিবানী: (অবাক হয়ে) সে কি গো? হিজড়ে রা তোমার মেয়ের বিয়েতে আসলে তোমার তো মান ইজ্জত যাবে সব।

বাবা: না মা যাবে না.. তোমরা এসো আমি আমার যথা সাধ্য চেষ্টা করবো তোমাদের আপ্যায়ন করার।

লক্ষ্মী: (হেসে) হ্যাঁ তারপর ওই দিন তুমি পাল্টি খেয়ে তাড়িয়ে দিলে আমাদের ।

বাবা: না না একদম এসব ভেবো না … এই বুড়ো মানুষটা কথা দিচ্ছে তোমাদের..

লক্ষ্মী: (পাশে তাকিয়ে) কিরে কি করবি তোরা? উনি যা বলছে তোরা কি রাজি তাতে?

চুমকি: (বিব্রত হয়ে) আরে যেভাবে বলছে.. কিছু তো বলতেও পারছি না… কি করবি.. থাক শুনে নে যা বলছে..

লক্ষ্মী: (মেয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে) ঠিক আছে কাকু .. আপনি যেমন বললেন তাই হবে..
(পাশে তাকিয়ে) কিরে সবাই এখনও বল কিন্তু…

(সকলে একসঙ্গে: আরে ছাড় ঠিক আছে.. শুনেছি সব.. ছেড়ে দে ছেড়ে দে)

চুমকি: আচ্ছা ঠিক আছে…. তাহলে ওই কথাই থাক। কি আর বলবো। আমরা গেলাম তাহলে।

(একে একে সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(বিকেলের লোকাল ট্রেন। জেনারেল কামরা।)

লক্ষ্মী: এই ভাই কিছু দিয়ে যা।

১ম ছেলে: আজকে নেই গো..

লক্ষ্মী: থাক ছাড়.. তুই তো দিস থাকলে।
(পাশের ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে)
এই যে তুমি। নদের চাঁদ আমার। কোনও দিনই তো টাকা দাওনা। আজকে কিছু দিয়ে যাও।

২য় ছেলে: (রেগে গিয়ে)আরে গায়ের থেকে হাত টা সরাও তো.. কেমন অস্বস্তি লাগে। এসব কি স্বভাব হ্যাঁ? যা বলার দূর থেকে বলো। একদম গায়ে হাত দেবে না। আর কোনো পয়সা নেই এখন আমার কাছে . আগে যাও।

লক্ষ্মী: (একটু নিচু গলায়) আরে হ্যাঁ গো হ্যাঁ.. যাচ্ছি .. কি না সোনার অঙ্গ তোমার.. হাত দিয়েছি বলেই খসে গেলো একদম।

২য় ছেলে: (অস্ফুটে) যত আপদের উৎপাত।

(মৈথিলী আজও এই ট্রেনে ফিরছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি ম্যাগাজিন পড়ছিল। এবারে লক্ষ্মী তার দিকে এগিয়ে যায়)

লক্ষ্মী: কিরে সুন্দরী তুই আবার এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি পড়ছিস? (মৈথিলীর হাত থেকে ম্যাগাজিন টা নিয়ে একটু দেখে) ওমা এতো ইংরেজি রে.. থাক তুই পড়। আমি তো একটু একটু বুঝি… পড়ে লাভ নেই… দে কিছু দিয়ে যা..

মৈথিলী: (একটু হেসে) হ্যাঁ দাঁড়াও..

লক্ষ্মী: (মৈথিলীর দিকে ভালো করে তাকিয়ে হঠাৎই তার কপালে হাত দিয়ে) কিরে তোর তো দেখি চোখ ছলছল করছে। জ্বর আসবে মনে হয়।

মৈথিলী:(টাকা দিতে দিতে) হ্যাঁ তেমনই লাগছে।

লক্ষ্মী: তো ওষুধ থাকলে খেয়ে নে.. আর ঐ দিকে দেখ… সিট খালি হলে বসে যা।

(মৈথিলী এতো ক্ষণে মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেবে আসল কথাটা বলার জন্য)

মৈথিলী: হ্যাঁ সে বসে পড়বো। তোমাকে একটা কথা বলবো।

লক্ষ্মী: (একটু অবাক হয়ে) তুই আবার আমাকে কি বলবি?

মৈথিলী: হ্যাঁ বলবো। কিন্তু তার জন্য তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

লক্ষ্মী : হ্যাঁ কি বলবি বল। ওই দিকে এখনও যাওয়া হয়নি।

লক্ষ্মী:(অনেকটা অবাক হয়ে) হ্যাঁ রে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

মৈথিলী: না না সেসব না। তুমি নামবে কিনা বলো? আমি তোমায় কিছু টাকা দেবো। এই মানে তোমার যে কাজের সময় নষ্ট হবে তার জন্য।

লক্ষ্মী: (একটু রেগে) তুই বলতে কি চাস বলতো?

মৈথিলী: তুমি শুধু একবার চলো। তারপর সব বলছি। চলো।

লক্ষ্মী: ঠিক আছে যাবো। কিন্তু টাকাটার কথা কিন্তু ভুলিস না।

মৈথিলী: (উচ্ছ্বসিত ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ মনে থাকবে। বলেছি তো।

(মৈথিলী আর লক্ষ্মী পরের স্টেশন এ নেমে যায়)

মৈথিলী: (স্টেশন এর একটা বসার জায়গা নির্দেশ করে) বসো এখানে সব বলছি।

লক্ষ্মী: হ্যাঁ হ্যাঁ বল তাড়াতাড়ি।

মৈথিলী: শোনো আমাদের একটা এনজিও আছে। তোমাদের মতো মানুষদের দিয়ে আমরা কাজ করি…

লক্ষ্মী: (মৈথিলী কে মাঝপথে থামিয়ে)
হ্যাঁ তো এর মধ্যে আমি কি করবো?

মৈথিলী: আরে দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি সব। দেখো তোমাকে বেশ কিছু দিন ধরে তো দেখছি…কখনো কখনো মনে হয়েছে তুমি কিছুটা আলাদা বাকিদের থেকে। হয়তো কিছু কিছু পড়াশুনা জানো।

লক্ষ্মী: আলাদা আলাদা বলিস না। হিজড়া তো হিজড়া থাকবেই। তোর মতো বা অন্য দের মতো কি হবে কখনো?

মৈথিলী: (সহানুভূতি দেখিয়ে) এভাবে বলো না। একেবারে আমাদের মতোই যে তোমাকে হতে হবে কে বলেছে তোমাদের? তোমাদের মধ্যে যে নারী সত্ত্বা আছে তোমরা তাই নিয়েই বাঁচবে।

লক্ষ্মী: সে তো তুই বলছিস। বাকিরা তো বলে হাফ মেয়েছেলে।

মৈথিলী: সে যার যেমন রুচি তেমন বলে। তোমাকে আসল কথাটা বলি। তুমি আমাদের কাছে পড়াশুনা শিখবে?

লক্ষ্মী: (একটু অবাক হয়ে) কি বলিস তুই এসব!! দু পাতা পড়তে পারি বলে লাইনের বাকি মেয়েরা কত কথা শোনায়। এখন আবার এসব শুনলে আমার টেকা দায় হয়ে যাবে। দুবেলা খাওয়া জোটাতেই দম ফুরিয়ে যায়… এত পয়সা আমি কোথায় পাবো?

মৈথিলী: কে কি বলবে বলে তুমি সুযোগ পেয়েও পড়বে না।? আর পড়াবো তো আমরা.. কোনো টাকা পয়সা লাগবে না … দেখো তোমাকে দেখে মনে হলো তোমাকেই আগে বলি। তারপর তোমাদের সঙ্গে যারা আছে ওদের সবাইকেই বলবো। তুমি ভেবো না। সব দায়িত্ব আমার। তুমি শুধু শুরুটা করো। বাকিটা আমি সব সমলে নেবো।

লক্ষ্মী: না না এসব ফালতু কাজ করে কোনো লাভ নেই। এসব করে হবেটাই বা কি? কেউ তো কাজ ও দেবে না।

মৈথিলী: (লক্ষ্মীর কাঁধে হাত রেখে আবেদনের সুরে) কাজের ব্যবস্থা আমরা করবো। এনজিও র তরফ থেকে। তুমি শুধু একবার রাজি হয়ে যাও।

লক্ষ্মী: তোকে আমি বিশ্বাস করবো কেন বলতো? কাজের কাজ না হলে সবাই তো খিল্লি করবে আমাকে নিয়ে। তখন তোরে আমি কোথায় পাবো?

মৈথিলী: দেখো তোমাকে আমি বেশ কিছু দিন ধরে দেখছি। তুমিও দেখছো। একটু বিশ্বাস করে দেখো। না হলে আবার তোমার এই কাজে ফিরে এসো। এটা তো থাকলোই।

লক্ষ্মী: আচ্ছা দেখছি আমি ভেবে চিন্তে।

মৈথিলী: না না তুমি এখনই বলে যাও। আমাকে সেই মতই সব ব্যবস্থা করতে হবে। আর বাকিদেরও তোমাকেই রাজি করাতে হবে।

লক্ষ্মী: তোর এতো কি তাড়া বলতো? কোনো অন্য ধান্দা নেই তো তোর? আর আমি ওসব রাজি করাতে পারবো না। তুই তো আর থাকিসনা …তুই বুঝবি না যে ঐ বস্তির পরিবেশ ঠিক কেমন। বেশি করলে আমাকেই ঘাড় ধরে বের করে দেবে।

মৈথিলী: অনেক ধান্দা আছে। তুমি শুধু হ্যাঁ টা বলে যাও। সব দেখতে পাবে। আর বাকিদের বিষয়টা তাহলে থাক এখন। আগে তুমিই এসো। বাকিটা আমি দেখছি পরে।

লক্ষ্মী: (কিছুক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে ভেবে তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে)
বেশ বললাম আমি হ্যাঁ। পড়বো আমি। জীবনে অনেক স্বপ্নই তো ছিল বড়ো মানুষ হওয়ার।দেখি তোর কথা শুনে কি উদ্ধার হয় আমার।

মৈথিলী: (আনন্দে লক্ষীর হাত দুটো ধরে) উফ বাঁচালে তুমি আমাকে! এই ভরসা টাই দরকার ছিল আমার। আমি খুব শিগগির সব ব্যবস্থা করছি। তোমাকে জানিয়ে দেবো খন।
(ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে) এই নাও তোমার টাকাটা। আমি দেবো বলেছিলাম।

লক্ষ্মী: (একটু গভীর দৃষ্টিতে মৈথিলী র দিকে তাকিয়ে) রেখে দে তুই টাকা। বিশ্বাসের কোনো দাম হয়না। আমি যাই।

(মৈথিলীঅবাক হয়ে বসে থাকবে, লক্ষী বেরিয়ে যাবে)

পঞ্চম দৃশ্য

[পূর্বোক্ত বিয়ে বাড়ি। বিয়ের দিন সন্ধ্যে। লক্ষী, চুমকি সহ বাকি কয়েকজনের একসঙ্গে প্রবেশ]

লক্ষ্মী: (মেয়ের বাবার দিকে নির্দেশ করে) কই গো? বিয়ে শুরু হয়ে গেছে নাকি?

বাবা: হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দিকে হচ্ছে। তোমরা যাও দেখে এসো। তারপর নাহয় খেতে বসবে।

চুমকি: (অবাক হয়ে বাকিদের দিকে তাকিয়ে তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে) সে কি গো !! আমরা যাবো বিয়ের মণ্ডপে?

বাবা: হ্যাঁ যাও। দেখে এসে খেতে বসবে একেবারে।

শিবানী: বলি মাথা কি ঠিক আছে? আমরা বিয়ের ওখানে গেলে ছেলের বাড়ির লোক যে ভিরমি খাবে গো…

বাবা: আরে না না। সবাই সব জানে। আমি বলেই রেখেছি, আজকে কিছু বিশেষ অতিথি আসবে। তোমাদের কাকিমা একটু বকবক করতে পারে। কিন্তু তোমরা কান দিও না বেশি, বুঝলে? চলো চলো… দেখি ….

(কিছুটা দূরের থেকে বিয়ে দেখে সকলে আবার ফিরবে)

বাবা: বেশ বেশ দেখলে তো.. চলো খাবার ওখানে তোমাদের বসিয়ে দিয়ে আসি…

লক্ষ্মী: আমরা কিন্তু খেতে আসিনি কাকু ..

বাবা: (অবাক হয়ে) সে কি!! আমি তো তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম… খাবে না কেন?

লক্ষ্মী: (একটি খামে কিছু টাকা মেয়ের বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে) হ্যাঁ সেই জন্যই এই উপহারটা দিতে এসেছিলাম….

বাবা: (আপ্লুত হয়ে) সে কি! কি বলছ!!

শিবানী: (ধরা গলায়) হ্যাঁ কাকু ওই জন্যই এসেছি। এই প্রথম আমরা কোনো বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণ পেয়েছি… মনে হচ্ছে আমাদেরই বোনের বিয়ে.. তাই….

লক্ষ্মী: হ্যাঁ.. এবার তবে আমরা চলি…. আশীর্বাদ করে এসেছি… আমাদের বোন ভালোই থাকবে।

(সকলে বেরিয়ে যাবে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দুপুর বেলার সময়। মৈথিলি আসে স্টেশন এ লক্ষ্মীর সাথে কিছু জরুরী কথা বলতে।]

মৈথিলী: শোনো তোমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। যেমনটা তোমাকে আমি বলেছিলাম সেরকম একটা কাজ ও আমরা খুঁজে রাখতে চেষ্টা করবো এনজিও র তরফ থেকে। এখন শুধু তোমাকে পুরো চেষ্টা করতে হবে। ব্যাস..

লক্ষ্মী: (একটু ইতস্তত করে) বলছি কি এসব করার কি খুব দরকার আছে? শেষ অব্দি কিছুই হবে না দেখিস। ফালতু লোক হাসাবি তুই।

মৈথিলী: যে লোকেরা কোনো কিছুর আসল কারণ কখনও খোঁজেইনি, কিছু মানুষকে অকারনেই আলাদা তকমা এঁটে হাতে পায়ে হাজার লাঞ্ছনার শিকল বেঁধে দিয়েছে, তাদের হাসি আজ তোমার নিজের স্বপ্ন এর থেকেও বড় হলো নাকি?
(পিছন থেকে এর মধ্যেই চুমকি সহ আরও কয়েকজন এর প্রবেশ)

চুমকি: (লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে) কিরে কি হয়েছে শুনেছিস?

লক্ষ্মী: কৈ না তো? কেন কার আবার কি হয়েছে শুনি?

চুমকি: আজই সকালের দিকে আমাদের শিবানী ওই স্টেশন এর চায়ের দোকানের ওখানে চা খাচ্ছিল। তো ট্রেন থেকে নেমে এক আধ বুড়ো লোক দোকানে এসেছিল। সে নাকি চুমকি কে দেখে ওর সঙ্গে শয়তানি শুরু করেছিল।

লক্ষ্মী: (বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) সে কি রে! আমি তো কিছুই জানলাম না! তারপরে কি হলো? শিবানী কোথায়? আগে বলবি তো এসব!

মৈথিলী: আরে তারপর কি হয়েছে ঠিক করে বলো ।

চুমকি: আর কি বলবো বলো তো? যা হওয়ার তাই হয়েছে। দোকানদার সেই লোককে তো কিছু বলেইনি উল্টে শিবানিকেই নাকি অপমান করে তাড়িয়েছে।

লক্ষ্মী: (প্রচণ্ড রেগে) এই শালা জানোয়ার গুলো কোনো দিনও মানুষ হবে না। আগে তো জানতাম মেয়ে দেখলে এগুলোর নখ দাঁত বের হয়। শালারা হিজড়া গুলোকে অব্দি ছাড়লো না। ছিঃ ছিঃ থুঃ থুঃ… ইচ্ছে করছে এক্ষুনি ওর..

মৈথিলী: আরে দাঁড়াও দাঁড়াও এক্ষুনি এত মাথা গরম করো না।

লক্ষ্মী: (ততোধিক রেগে) দেখেছিস তো? বলেছিলাম না যাই হয়ে যাক সমাজ কোনো দিনও বদলাবে না। লোকে আমাদের নিয়ে বই লিখবে, গান লিখবে , ব্যাবসা করবে। কিন্তু কাজের কাজ? কিছুই হবে না। অমন শিক্ষিতর কপালে না আমি ঝাঁটা মারি।

মৈথিলী: (লক্ষ্মীর কথা মাঝপথে থামিয়ে) না না ভুল করছো। এভাবে তুমি কিছুই করতে পারবে না। লড়াইটা এত সহজ নয়। প্রকৃত শিক্ষার আলো দিয়ে, স্বনির্ভর হয়ে তোমাদের এর জবাব দিতে হবে।

লক্ষ্মী: তোর ওইসব কাব্য করা কথা তুই রেখে দে। আমার যা বোঝার বুঝে গেছি আমি ভালোই।

মৈথিলী: (একটু অনুনয় এর সুরে) শুধু একবার আমার কথাটা একটু শুনে দেখো। যদি তোমাদের জীবনের কোনো পরিবর্তন না ঘটাতে পারি তবে আবারও তোমরা এই কাজে ফিরে এসো নাহয়। কেউ আটকাবে না।

লক্ষ্মী: ঠিক আছে তাই হবে। শুধু মনে রাখিস কিচ্ছু কাজ না হলে সব দোষ কিন্তু তোর।

মৈথিলী: বেশ তাই হবে। তবে তোমরা কাল থেকেই আসছো আমাদের ওখানে এটাই ঠিক হলো। আমি এখন চলি। কাল দেখা হবে।

সপ্তম দৃশ্য

[চার বছর পরের দৃশ্য। লক্ষী এখনও নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি সম্মানজনক কাজের সঙ্গে সে যুক্ত আছে। এবং যে এনজিও তে সে এসেছিল এখন সেখানকার একজন অন্যতম কর্মী।তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে এনজিওর একটি অনুষ্ঠান। একটি ঘর সাজানো রয়েছে অনুষ্ঠানের জন্য। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায় এর দৃশ্য। সঞ্চালিকা এবার এই এনজিওর লক্ষ্মীকে ডেকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করবে]

সঞ্চালিকা: আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। এবার আমাদের সংগঠনের অন্যতম উদ্যোগী ও পরিশ্রমী সদস্য লক্ষীকে।

লক্ষ্মী: (উঠে সকলকে হাত জোড় করে প্রণাম করে) আমি কি বলবো আমি নিজেই জানিনা। আমরা তেমন গুছিয়ে কথা তো বলতেও পারি না।

শুধু একটাই কথা বলবো যে আজকের এই দিনটা পর্যন্ত আসার পথ টা কখনও সহজ ছিল না। যে সমাজে, যে অবস্থায়, যে শরীর নিয়ে জন্মেছি তাকে নিজে স্বীকার করা এবং এই সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করার লড়াই শিখেছি। আরো শিখবো, আর লড়েই যাবো শেষ দিন পর্যন্ত। আর যে দিদি আমাকে এই আলোর মিছিলে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন তাকেও আমার প্রণাম, যদিও আজ তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

(একটু দূরে বসে থাকা নিজের সহযোদ্ধাদের ডেকে নিজের সঙ্গে ডেকে নিয়ে) আমার পাশে যে

মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারা আমার সহযোদ্ধা। আমি রোজ তাদের দেখে অনুপ্রেরণা পাই। রোজ নিজেকে একবার করে মনে করিয়ে দেই এই সমাজে আমাদের যা যা অধিকার আছে তার সবটুকু প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত যেন আমাদের লড়াই জারি থাকে।

(লক্ষ্মী এবং তার সহযোদ্ধারা একসঙ্গে স্টেজের সম্মুখে উপস্থিত হবে)

লক্ষ্মী: আমরা যে শরীর আর যে নারীসত্ত্বা নিয়ে সহাবস্থান করছি তা কোনো ব্যাধি নয়, বরং প্রকৃতির অমোঘ লীলা।

১ম মেয়ে: আলাদা কোনো পৃথিবী আমরা গড়তে চাইনা। এই একই পৃথিবীতে তোমাদের সবার সঙ্গে একসাথে বুক ভরে শ্বাস নিতে চাই।

২য় মেয়ে: মনের সব ঘৃনা, সংকোচ, হিংসা মুছে ফেলে চলো হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আমরা এক আলোর পৃথিবী গড়ে তুলি যেখানে সকলে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচবে.....

[সমবেত কবিতা]

আমরা যেমন খেলা করছি, সন্ধ্যায় আড্ডা জমাচ্ছি ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে..
ওরাও আসুক এই আড্ডায় সামিল হতে একসাথে।
মানুষ তো একই তবে আড়ালে কেন তাদের জীবন?
চলো সব প্রথা মেনে এবার একসাথে বাঁচুক সকলের মন।
কটূ কথা কত বিরক্তি ... প্রথাগত সমাজে ধেয়ে আসে কত রোষ!
রক্তের দরকারে মুছে যায় সব দোষ।
হাতে হাত সারি সারি, বাঁচবার হুশিয়ারি ,
আমরা যে চাই মিলেমিশে শ্বাস নিতে,
গোটা পৃথিবীই হোক আমাদের বাড়ি।

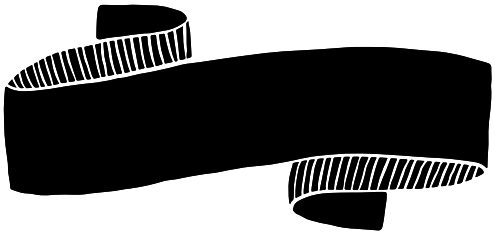

বীরাঙ্গনা

সুরভী ঘোষ

দৃশ্য : ১

(মোহিনী দেবী ও ঝিমলি একটি ঘরে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যস্ত।)

ঝিলমি - না না না..। আমি কিছুতেই আমার সাথে এমন অন্যায় হতে দেব না মা।কিছুতেই না।

মোহিনী দেবী - কি করবি তুই? কিছুই করতে পারবি না রে মা।

ঝিমলি - কে বলল আমি কিছু করতে পারব না। আমি করে দেখাব মা। তোমরা ওদের ওই অন্যায় মুখ বুজে মেনে নিয়েছো, তাই বলে আমি এ অন্যায় মুখ বুজে মানব না। তোমারা রুখে দাঁড়াতে পারোনি, তোমারা প্রতিবাদ করতে পারোনি , কিন্তু আমি প্রতিবাদ করব। ওদের বুঝিয়ে দেব আমরাও মানুষ কোনো কলের পুতুল নই যে যেভাবে খুশি চালাবে, আর আমরা সেভাবেই চলব।

মোহিনী দেবী - তোর কি মনে হয় ঝিমলি আমরা প্রতিবাদ করিনি?

ঝিমলি - করেছো বলছো?

মোহিনী দেবী - হ্যাঁ, করেছি তবে কোনো লাভ হয়নি। উল্টে বেড়েছে অত্যাচারের পরিমাণ, বেড়েছে না খেয়ে থাকার যন্ত্রনা। শরীরের পাশাপাশি মানসিকভাবে ও ভেঙে পড়েছি এখন, তাই আর ইচ্ছা করেনা প্রতিবাদ করতে। কারন জানিস আমরা মেয়ে এসমাজ একটা মেয়েকে কলঙ্কিনী বলার আগে দুবার ভাবে না। তারা ভাবে না পুরুষের স্পর্শ না পেলে কোনো নারী অপবিত্র হয় না, কলঙ্কিত হয় না।

ঝিমলি - পুলিশের কাছে কেন যাওনি মা?

মোহিনী দেবী - বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার ই অনুমতি নেই, সেখানে আবার পুলিশ স্টেশন। তবে হ্যাঁ, আমি তোর ঠাকুমার সাহায্যে একবার রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম পুলিশের কাছে সব জানাতে।

ঝিমলি - তারপর পুলিশ শোনেনি তোমার কথা?

মোহিনী দেবী - হ্যাঁ, খুব শুনেছিল। (ব্যঙ্গ করে বলে)আমাকে বলল চলুন আপনাদের বাড়ি। বাড়িতে এসে কি হল জানিস?

ঝিমলি - কি হল মা?

মোহিনী দেবী - বাড়িতে এসে আমাকে অবাক করে দিয়ে তোর বাবার হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তোর দাদুকে বলে নিন মোড়ল মশাই আপনার পুত্রবধূ কে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আপনারা কেমন লোক বলুন দেখি আপনাদের বাড়ির বৌ রাত বিরেতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে থানায় চলে যাচ্ছে আপনাদের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য,আর আপনারা এখানে বাপ ব্যাটাতে নিশ্চিত মনে মদ্যপান করছেন। তা এভাবে চলতে থাকলে তো আপনাদের ব্যবসা লাটে উঠবে মশাই।

ঝিমলি - পুলিশরাও ওদের দলে। এই ওরা দেশের আইন রক্ষক, এভাবে এরা আমাদের সুরক্ষার ভার নিয়েছে। ছিঃ..

মোহিনী দেবী - এটুকু শুনেই ছিঃ বলছিস। জানিস,,আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কি পুরস্কার পেয়েছিল?

ঝিমলি - কি? (বেশ কৌতুহলের সাথে প্রশ্ন করে ঝিমলি)

মোহিনী দেবী - বিনা মূল্যে এক রাতের জন্য আমাকে ভোগ করার অধিকার।
কথা টা বলেই বেশ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওঠে মোহিনী। তারপর বলে --
মোহিনী দেবী - আর তুই কিনা বলছিস প্রতিবাদ করতে। আর কিছু করার নেই রে ঝিমলি। বাকি জীবন টা এই নরকেই তিলে তিলে শেষ হতে হবে। এটাই হয়তো নিয়তি। আমরা আমাদের নিয়তি মেনে নিয়েছি রে। তুইও মেনে নে।

ঝিমলি - নিয়তি কি মা? নিয়তির দোহাই দিয়ে এভাবে নিজের জীবন শেষ করতে আমি পারব না। আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব এই অন্যায় বন্ধ করার। তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয় ওদের হাতে তবুও কোনো দুঃখ হবে না মা। কারন আমি মরলেও এই পাপের রাজত্ব তো শেষ হবে আর কিছু না হোক তুমি, জেঠিমা, কাকিমা,, ঠাম্মি , দিদিরা, বোনেরা তোমরা সবাই মিলে তো একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।
মোহিনী দেবী - কিন্তু.....

দৃশ্য: ২

(আর কিছু বলতে পারে না মোহিনী তার আগেই রজতবাবু অর্থাৎ ঝিমলির বাবা সেখানে আসেন হাতে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। তারপর বলেন --)

রজত বাবু - এই নে মোহিনী তোর প্রতিবাদী মেয়েকে তৈরি করে দে রাতের জন্য।

ঝিমলি - না আমি আমি তৈরি হব না। কি ভেবেছ কি তোমরা, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করবে। আমাদের কি নিজেদের কোনো মতামত নেই?

রজত - মেয়ে মানুষের আবার মতামত। দেখ বেশি তেজ না দেখিয়ে চুপচাপ তৈরি হয়ে নে, নাহলে তোর তেজ কি করে কমাতে হয় সে আমার ভালো করে জানা আছে।

ঝিমলি - কি করবে মারবে? মারো, যত ইচ্ছে মারো। তোমাদের মারের ভয় আর এই ঝিমলি পায় না। এমনিতেই সারা শরীর কালশিটেতে কালো হয়ে উঠেছে আর কোথায় মারবে?

রজত - মোহিনী নিজের মেয়েকে সামলা বলে দিচ্ছি। নিজের বাপের মুখে মুখে কথা বলতে ওর লজ্জা করছে না?

ঝিমলি - কে বাবা তুমি! নিজেকে বাবা বলে দাবি করতে তোমার লজ্জা করে না?
রজত - ঝিমলি... (বলে গর্জে ওঠে রজত)

ঝিমলি - চোখ রাঙিয়ে কোনো লাভ নেই মি. রজত। আপনার চোখ রাঙানি দেখে ভয় পাবার পাত্রী এই ঝিমলি নয়। কি ভুল বলেছি আমি? যা বলেছি একদম ঠিক বলেছি। আপনি জানেন বাবা কাকে বলে? বাবা কথার আসল অর্থ কি? শুধু জন্ম দিলেই বুঝি বাবা হওয়া যায় ।

রজত - মোহিনী আমার মাথা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে এবার ওকে থামতে বল, নাহলে কিন্তু এর ফল ভালো হবে না বলে দিলাম। (রেগে বলে)

ঝিমলি - কাকে শাসাচ্ছ... (ঝিমলিকে আর কিছু বলতে দিয়ে ওর হাতটা টেনে ওকে আটকে দেয় মোহিনী।)

মোহিনী - আহ্, ঝিমলি কি হচ্ছে টা কি, চুপ কর বলছি। তুমি যাও আমি ওকে তৈরি করে দিচ্ছি। (রজত বাবু একবার রাগী চোখে ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। রজত বেরিয়ে যেতেই ঝিমলি বলে --)

ঝিমলি - তুমি কেন আমাকে কিছু বলতে দিলে না মা?

মোহিনী - আর কিছু বলিস না ঝিমলি। চুপচাপ তৈরি হয়ে নে। ওদের এসব বলে কি কিছু হবে বল তো?

দৃশ্য: ৩

(আর প্রতিবাদ করেনি ঝিমলি। তবে কিছু তো করতে হবেই ভেবে ও চলে যায় নির্দিষ্ট ঘরে। ঘরে একটা হালকা নীল আলো জ্বলায়,,ঘরটি নীলাভ হয়ে উঠেছে। ঘরে পাইচারি করতে করতে ঝিমলি ভাবে - আচ্ছা যদি আমি যে এখন এ ঘরে আসবে তার কাছে সাহায্য চায়! তাহলে কেমন হবে, সে কি আমাকে সাহায্য করবে । না না এসব কি ভাবছি আমি এদের কাছ থেকে নাকি আমি সাহায্য পাব। (হেসে ওঠে ঝিমলি)। সত্যি আমিও পারি।

যাই হোক তাহলে কি করব আমি? এত কড়া পাহারা এড়িয়ে এখান পালানো তো একপ্রকার অসম্ভব । কিন্তু তাই বলে তো মুখ বুজে এসব সহ্য করার কোনো মানে হয়না। কিছু তো একটা করব ই। যেভাবেই হোক এখান থেকে বেরোতে হবে। নাহলে এই চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী থেকে না নিজে বাঁচতে পারবো আর না তো কাউকে বাঁচাতে পারবো। কেউ কি আসছে...)

দৃশ্য: ৪

(এমন সময় কারো আসার পায়ের শব্দ পেয়ে ঝিমলি তড়িঘড়ি গিয়ে লুকিয়ে পড়ে দরজার পিছনে। একটা লোক ফোনে কারো সাথে কথা বলতে বলতে দরজা ঠেলে ভেতরে এল। লোকটা ভেতরে এসে ফোনটা পকেটে রেখে চারিদিকে তাকাচ্ছে, এই সুযোগে ঝিমলি হাতের কাছে থাকা ফুলদানি টা তুলে নিল। ও লোকটার মাথায় মারতে যাবে তখনই লোকটা সরে যায় ওখান থেকে। ঝিমলি অপেক্ষা করে পরবর্তী সুযোগের । এবার মারতে গেলে লোকটা আটকে দেয় ঝিমলি কে। হাত ধরে ফেলে ওর। যাহ্ ঝিমলি যে মারতে পারল না লোকটাকে এবার কি হবে??

লোকটা ঝিমলির হাতটা পিছনের দিকে মুচড়ে ধরে,ফুলদানি টা কেড়ে নেয় ওর হাত থেকে। তবে ঝিমলিও দমে যাওয়ার মেয়ে নয়। ঝিমলি চেষ্টা করল নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার কিন্তু পারল না। এবার লোকটা বেশ রাগী স্বরে বলে উঠল ----)

আগন্তুক - তোর সাহস তো কম না। তুই আমাকে মারতে গিয়েছিলি?? (রাগী কণ্ঠে)

ঝিমলি - যা করেছি, বেশ করেছি। একবার হাতটা ছেড়ে দে তারপর দেখ কি হাল আমি করি তোর। (রুক্ষ স্বরে)

আগন্তুক - তোর তো দেখছি বহুত তেজ। হাতে ব্যাথা পেয়ে কোথায় হাত ছেড়ে দেওয়ার জন্য মিনতি করবি,, পা ধরে ক্ষমা চাইবি তা না,, মুখে তো দেখছি খই ফুটছে।
ঝিমলি - ক্ষমা.. (বলে বেশ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে ঝিমলি।) । তোদের মত কাপুরুষদের কাছে আবার ক্ষমা কি চাইব রে??

আগন্তুক - কাপুরুষ.. কাপুরুষ কাকে বলে জানিস?? কি এমন করেছি যে কাপুরুষ বলছিস আমায়??

ঝিমলি - তুই জানিস পুরুষ কাকে বলে?? যারা প্রকৃত পুরুষ তারা কখনও কোনো নারীকে অসম্মান করে না বুঝলি। তারা তোদের মতো নারীদের ভোগের সামগ্রী মনে করে না।
আগন্তুক - তুই আমাকে শেখাবি পুরুষ কাকে বলে? (হেসে ওঠে) । হাসালি রে, তোরা নিজেরাই তো নিজেদের কে ভোগের সামগ্রী বানিয়ে রেখেছিস আমাদের মতো পুরুষ দের জন্য। আর আমরাকি বিনা পয়সায় ভোগে হাত দিই নাকি,, তার জন্য তো বেশ ভালো রকম ই খসাতে হয় আমাদের।

(আগন্তুকের কথা শুনে ঝিমলি কেমন যেন খানিকটা নরম হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে - সত্যিই তো এরা তো আর বিনা পয়সায় আমাদের উপর অত্যাচার করে না। আমাদের অত্যাচার করার জন্য বেশ মোটা অঙ্কের টাকা বাইরে জমা দিয়ে আসতে হয়। তাই আগের তুলনায় বেশ খানিকটা নরম সুরে ঝিমলি বলে---)

ঝিমলি - শোন সব মেয়েরা অর্থের জন্য এসব করে না,, কেউ কেউ বাধ্য.....
(তবে আগন্তুক ঝিমলির কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে ওঠে -----)

আগন্তুক - এই মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না তো। বাইরে নগদ ২০,০০০ হাজার টা কি সারারাত ধরে তোর লেকচার শুনবো বলে দিয়ে এলাম।
(একটু আগে বেশ নরম হয়ে গেলেও, লোকটার এই কথাটা শুনে আবার তেতে উঠলো ঝিমলি। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে লোকটার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে,বেশ ঝাঁঝালো কন্ঠে বলল -----)

ঝিমলি - টাকা যাকে দিয়ে এসেছিস, তার সাথে গিয়ে রাত কাটা গে যা। আমার কাছে এসেছিস কি মরতে??

আগন্তুক - এই মেয়ে শোন আমার মাথা আর গরম করাস না কিন্তু এর ফল ভালো হবে না বলে দিলাম। টাকা নিবি আবার অস্বীকার ও করবি। এটাই কি তোদের ধর্ম রে?

ঝিমলি - মুখ সামলে কথা বলুন। আপনি বা আপনার মতো হাজার লোক যে বান্ডিল বান্ডিল টাকা দিয়ে যান তা আমরা কোনোদিন চোখেও দেখি না ছোঁয়া তো দূর। আপনারা ভাবেন বটে যে আমরা স্ব ইচ্ছায় একাজ কে আমাদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। তাই জানিয়ে রাখি এ সম্পূর্ণ আপনাদের ভূল ধারনা।

আগন্তুক - তাই নাকি?? তা ঠিকটা কি শুনি?? আপনারা পূজনীয় বুঝি! (বেশ ব্যঙ্গর সুরে কথাটা বলে আগন্তুক)

ঝিমলি - পূজনীয় তো বটেই। নারী মায়ের জাত, তাই প্রতি টি নারীই পূজনীয়।
আগন্তুক - হু.. (তাচ্ছিল্য মিশ্রিত আওয়াজ বেরোয়) । তা তুই কি সারারাত কথা বলেই কাটাবি?? আমার টাকাগুলো কি সব জলেই দিবি??

ঝিমলি - একটা শেষ কথা বলি?

আগন্তুক - বল, সব যখন বললি,, তখন এটাই বা আর বাকি রাখবি কেন।

ঝিমলি - আপনাকে দেখে তো বেশ শিক্ষিত, ভদ্র, সভ্য ঘরের ছেলে মনে হচ্ছে। তা আপনি এমন অশিক্ষিতের মতো আচরণ কেন করছেন বলুন তো। আজ যদি আমার জায়গায় আপনার মা অথবা বোন থাকত তাহলেও কি আপনি তাদের সাথে এই ব্যবহার টাই করতেন??

আগন্তুক - কি বলছিস কি এসব?? আমার মা, বোনের সাথে তোর মতো একটা নোংরা, বাজে মেয়ের তুলনা করছিস।

ঝিমলি - খুব গায়ে লাগল না কথাটা। আপনারা কেন বলুন তো সব মেয়েদের নিজেদের মা, বোনের মতো সম্মান দিতে পারেন না?? আর আমাকে নোংরা মেয়ে বলছেন মনে রাখবেন পাঁকেয় কিন্তু পদ্ম ফোটে।।

আগন্তুক - নিজের সাথে পদ্ম ফুলের তুলনা করে পদ্ম ফুলের সরলতা, পবিত্রতা নষ্ট করিস না।

ঝিমলি - হ্যাঁ, মেয়েরাই তো অপবিত্র হয়। মেয়েদের গায়ে খুব সহজেই যে কোনো রকম তকমা লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাই না। তবে মজার ব্যাপার টা কি জানেন তো আপনাদের মতো পবিত্র, ভদ্র, সভ্য পুরুষদের স্পর্শ না পেলে এ সমাজ কোনো নারীকে অপবিত্র বলতে পারে না। আপনাদের স্পর্শ না পেলে সমাজের চোখে কোনো নারী কলঙ্কিত হয় না। তাহলে ভেবে বলুন তো অপবিত্র টা কে ? নারী রা নাকি সেই পুরুষ রা যাদের স্পর্শে নারীকে কলঙ্কিনী,অপবিত্র অ্যাখা পেয়ে পেতে হয়। (বেশ তাচ্ছিল্যের সুরেই কথাগুলো বলে ঝিমলি)
(ঝিমলি র কথাগুলো শুনে আগন্তুকের হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল মনের ভিতর টা। মনে মনে সে ভাবল ---)

আগন্তুক - তবে কি সত্যি সত্যিই এই মেয়েটি এখানে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। তবে মেয়েটি সত্যি বলছে কি না তাও তো জানা নেই। (মনে মনে)
(লোকটিকে কিছু একটা ভাবতে দেখে সুযোগ বুঝে ঘরের জোরালো আলোটা জ্বালিয়ে দেয় ঝিমলি। হালকা নীলাভ আলোয় চোখটা কেমন সয়ে গিয়েছিল আগন্তুকের। তাই হঠাৎ আলোর তীব্রতা ই চোখ দুটো খানিকটা বন্ধ হয়ে এল। আলোটা চোখে সয়ে যাওয়ার পর চোখটা খুলতেই আঁতকে ওঠে লোকটি। বলে --)

আগন্তুক - একি,, তোমার শরীরে এ কিসের দাগ?

ঝিমলি - কিসের আবার,,প্রতিবাদের।

আগন্তুক - মানে! আমি তোমার হাত টা তখন মুচড়ে ধরেছিলাম তবে তার জন্য তো তোমার সারা হাতে কালশিটের দাগ পড়তে পারে না। তাহলে এত কালশিটে পড়ল কি করে তোমার হাতে ?

ঝিমলি - শুধু হাতে না এমন অজস্র দাগ আছে আমার শরীরে। শুধু আমার কেন এই নরকে থাকা প্রতিটি মেয়ের দেহেই এই দাগ দেখতে পাবেন।

আগন্তুক - তার মানে সত্যি সত্যি এখানে তোমাদের উপর অত্যাচার করা হয়। তোমরা নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে এখানে থাকতে বাধ্য হয়েছো!!

ঝিমলি - হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। আর আপনি,, আপনি কটু কথা বলার আগে দুবার ভাবলেন না।

আগন্তুক - আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি যে আপনাদের সাথে এমন কিছু হতে পারে। আপনাদের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে তা আপনারা পুলিশে জানান নি কেন?

ঝিমলি - পুলিশ,, হাসালেন (বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে) ।

আগন্তুক - কেন? হাসির কথা কি বললাম?

ঝিমলি - হাসির কথা নয়তো কি,, আমাদের বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার ই অনুমতি নেই। ২৪ ঘন্টা নজরবন্দী থাকি। কিন্তু পুলিশ প্রায় প্রতিদিন ই আসে আমাদের কাছে,আর কেন আসে সেটা নিশ্চয়ই আর বলে বোঝাতে হবে না?

আগন্তুক - আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি এই ঘর থেকে। আর আপনাদের এখান থেকে বের করার সব রকম চেষ্টা আমি করব কথা দিলাম।

ঝিমলি - এটুকু বলার জন্য ধন্যবাদ। তবে আমি কারো দয়া নিতে চাই না। আমি কাউকে আমার রক্ষাকর্তা হিসেবে চাই না। আমার নিজের লড়াই আমি নিজে লড়তে জানি।
আগন্তুক - এমা না না আমি আপনাকে দয়া করছি না।

ঝিমলি - সেই...কিছুক্ষণ আগেই যাকে নোংরা মেয়ে বলে হাজার টা কথা শোনালেন, এখন তার শরীরের ক্ষত গুলো দেখে দয়া করে তাকে বাঁচাবেন বলছেন। আবার বলছেন নাকি দয়া করছেন না।

আগন্তুক - আপনি ভুল বুঝছেন।

ঝিমলি - আর কিছু বুঝে আমার কাজ নেই,, আপনি যদি পারেন তো আমার একটা উপকার করবেন।

আগন্তুক - হ্যাঁ, বলুন।

ঝিমলি - আপনার ফোনটা একটু দেবেন।

আগন্তুক - তার মানে সত্যি সত্যি এখানে তোমাদের উপর অত্যাচার করা হয়। তোমরা নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে এখানে থাকতে বাধ্য হয়েছো!!

ঝিমলি - হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। আর আপনি,, আপনি কটু কথা বলার আগে দুবার ভাবলেন না।

আগন্তুক - আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি যে আপনাদের সাথে এমন কিছু হতে পারে। আপনাদের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে তা আপনারা পুলিশে জানান নি কেন?

ঝিমলি - পুলিশ,, হাসালেন (বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে) ।

আগন্তুক - কেন? হাসির কথা কি বললাম?

ঝিমলি - হাসির কথা নয়তো কি,, আমাদের বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার ই অনুমতি নেই। ২৪ ঘন্টা নজরবন্দী থাকি। কিন্তু পুলিশ প্রায় প্রতিদিন ই আসে আমাদের কাছে,আর কেন আসে সেটা নিশ্চয়ই আর বলে বোঝাতে হবে না?

আগন্তুক - আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি এই ঘর থেকে। আর আপনাদের এখান থেকে বের করার সব রকম চেষ্টা আমি করব কথা দিলাম।

ঝিমলি - এটুকু বলার জন্য ধন্যবাদ। তবে আমি কারো দয়া নিতে চাই না। আমি কাউকে আমার রক্ষাকর্তা হিসেবে চাই না। আমার নিজের লড়াই আমি নিজে লড়তে জানি।
আগন্তুক - এমা না না আমি আপনাকে দয়া করছি না।

ঝিমলি - সেই...কিছুক্ষণ আগেই যাকে নোংরা মেয়ে বলে হাজার টা কথা শোনালেন, এখন তার শরীরের ক্ষত গুলো দেখে দয়া করে তাকে বাঁচাবেন বলছেন। আবার বলছেন নাকি দয়া করছেন না।

আগন্তুক - আপনি ভুল বুঝছেন।

ঝিমলি - আর কিছু বুঝে আমার কাজ নেই,, আপনি যদি পারেন তো আমার একটা উপকার করবেন।

আগন্তুক - হ্যাঁ, বলুন।

ঝিমলি - আপনার ফোনটা একটু দেবেন।

আগন্তুক - কি করবেন?

ঝিমলি - একটা নম্বরে কল করবো।

আগন্তুক - হ্যাঁ, এই নিন। তবে কাকে কল করবেন রক্ষক ই আপনাদের ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। (ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলে)

(ঝিমলি কোনো উওর না দিয়ে কল করে। ওপর প্রান্ত থেকে ফোনটা রিসিভ হলে ঝিমলি নিজের সকল সমস্যা র কথা জানায় তাদের। আর ওপর প্রান্ত থেকেও আশ্বাস স্বরূপ আগামী কাল ই ওদের এখানে আসবে জানিয়ে দেয়। ঝিমলি আগন্তুকের থেকে একটু দূরে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলায় লোকটি ঝিমলি র কোনো কথাই শুনতে পেল না। শুধু একটি কথা ছাড়া ' পারলে আগামী কাল ই আসুন । ফোনটা রাখতেই আগন্তুক প্রশ্ন করে ---)

আগন্তুক - কাকে আসতে বললেন??

ঝিমলি - নারী সুরক্ষা দপ্তর।

আগন্তুক - নারী সুরক্ষা দপ্তর,, আপনি WOMEN HELP LINE NUMBER কি করে জানলেন?

ঝিমলি - আসলে কিছুদিন আগে আমি খবরের কাগজে একটা খবরে পড়েছিলাম। একটি বৈবাহিক ধর্ষণের কেস নিয়ে লেখা টি বেরিয়েছিল।

আগন্তুক - কিন্তু আমি যতদূর জানি আমাদের ভারতীয় আইনে বৈবাহিক ধর্ষণের কোনো কেস হয় না ! (অবাক হয়ে)

ঝিমলি - ভুল জানেন। কোনো মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করলেই সেটা ধর্ষণ হিসেবেই গণ্য হয়। মেয়েটি আর সহ্য করতে না পেরে 1091 অর্থাৎ WOMEN HELP LINE NUMBER এ কল করে। আর তারা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।
আগন্তুক - আচ্ছা, আপনি যদি আগেই জানতেন নম্বর টা তাহলে আগে কল করেননি কেন?

ঝিমলি - পারিনি। কারণ, আমাদের কাছে ফোন থাকে না। কারো ফোন নেওয়ার অধিকার ও আমাদের নেই। তবে জানেন আমি অনেক বার চেষ্টা করেছি এখানে যারা আসে তাদের কারো থেকে কল করার। কিন্তু..

আগন্তুক - পারেননি?

ঝিমলি - না। কারণ তারা সকলেই মদ্যপ অবস্থায় থাকে। আর তার থেকেও বড়ো কথা তাদের কারো কাছেই কখনো কোনো ফোন পাইনি। হয়তো ওদের ফোন নিয়ে আসতে দেওয়া হত না। তাই আজ যখন আপনাকে ফোনে কথা বলতে বলতে ঢুকতে দেখলাম, তখনই ভেবেছিলাম যে করেই হোক আজ আমাকে ফোন করতেই হবে।

আগন্তুক - তাই বলে আমাকে খুন করবেন ভেবেছিলেন?

ঝিমলি - ওই ফুলদানির আঘাতে বড়ো জোর অজ্ঞান হতেন, মারা যেতেন না আশা করি।

দৃশ্য : ৫

(এমন সময় একজন এসে জানায় আগন্তুকের সময় শেষ। তাকে এবার বেরাতে হবে। লোকটি চলে যাওয়ার পর আগন্তুক বলে----)

আগন্তুক - আপনি একা সব সামলাতে পারবেন তো?

ঝিমলি - পারতে আমাকে হবেই। আপনি অত ভাবতেন না। আপনার এই উপকার আমি কোনোদিনও ভুলবো না। আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম। আপনার টাকা টা শোধ দেওয়ার মত কিছুই নেই এখন আমার কাছে, যদি কখনো পারি আমি নিশ্চয়ই আপনার টাকা টা ফিরিয়ে দেব।
(আগন্তুক হালকা হেসে বিদায় নিল।)

দৃশ্য : ৬

(সকালে ঘুম উঠেই ঝিমলি বাড়ির সব মেয়েদের একটা ঘরে ডাকে। সবাই বসে একজায়গায়। এবার ঝিমলি ওদের বোঝাতে শুরু করে)

ঝিমলি - শোনো আমি তোমাদের কে একটা খুব জরুরি কথা বলব। কাল আমি WOMAN HELP LINE NUMBER এ কল করে ওদের আজ এখানে আসতে বলেছি। ওরা যে কোনো মুহুর্তে চলে আসবে। তোমরা সবাই কিন্তু নিজেদের শক্ত কর। আজ আমাদের মুক্তির দিন। আমরা সকলে মিলে ওই শয়তান গুলোর ভালোমানুষির মুখোশ আজ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

মোহিনী দেবী - এসব তুই কি বলছিস ঝিমলি? যদি ওরা জানতে পারে আমরা কেউ আর বাঁচবো না। এটা ভেবে দেখেছিস। (বেশ চিন্তিত ও ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলে)

ঝিমলি - আমরা যেভাবে বেঁচে আছে,,এটাকে কি আদেও বেঁচে থাকা বলে মা। রোজ তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

মোহিনী দেবী - তুই ভুল করছিস ঝিমলি। এসব করে কোনো সুরাহা তো হবেই না। উল্টে কষ্টের পরিনাম বাড়বে রে মা। তার চেয়ে ভালো তুই বন্ধ কর এসব।

ঝিমলি - না মা আমি পেছাবো না। আর তোমরাও ভয় পাবে না। ভুলে গেলে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে দুজনেই সমান দোষী। এতদিন তো সহ্য করলে এবার না হয় একবার প্রতিবাদ করেই দেখো।

মোহিনী দেবী - না ঝিমলি,, এতে হিতে বিপরীত হবে। তুই বন্ধ কর এসব। বারন করে দে ওদের আসতে।

(এদিকে রজত বাবুকে তার একজন লোক এসে খবর দিয়ে যায় যে বাড়ির সব মেয়ে বৌ রা মিলে একটা ঘরে বসে সকাল থেকে যে কি সব পরামর্শ করছে। তা শুনে রজত বাবু জলদি যান। এবং ঘরের বাইরে থেকে ওদের কথা শুনতে পেয়ে ভেতরে গিয়ে বলেন ----)
রজত - বাহ্ রে,, বাহ, কি করে মোহিনী খুব ভালো মেয়ে তৈরি করেছিস রে তুই। আমার খাবে আমার পড়বে, আবার আমার বুকে বসেই দাঁড়ি ওপরাবে।

মোহিনী দেবী - না না ঝিমলি কিছু করবে না। ও ছোটো তো ও ভুল করে ফেলছে ওকে ক্ষমা করে দাও দয়া করে। (হাত জোড় করে বলে)

রজত - তাই নাকি ও ছোটো। যেদিন ওর মুখে প্রথম প্রতিবাদের সুর শুনেছিলাম সেদিনই যদি ওর ওই বিষদাঁত ভেঙে দিতাম। তাহলে আজ ওর এত বিষ বাড়তো না। কিন্তু মোহিনী তুই তো জানতিস এর বিষ কত বাড়ছে। তুই কেন ওকে ঝামলাস নি বল। তার ফল ও এবার তুই ই ভোগ কর।
(বলে মোহিনী দেবীর গায়ে হাত তুলতে গেলে রজত বাবুর হাত ধরে ফেলে ঝিমলি। তারপর হাত নামিয়ে দিয়ে বলে ---)
ঝিমলি - শুনুন রজত বাবু অনেক দিন সহ্য করেছি আপনার অত্যাচার। তবে আর নয়। আপনার সময় ঘনিয়ে এসেছে।
(এই সব কান্ড থেকে ওখানে থাকা বাকি মেয়েরাও বেশ ভয় পেয়ে গেল।)

দৃশ্য : ৭

(এমন সময় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো নারী সুরক্ষা দপ্তরের সদস্যগণ, সাথে পুলিশ বাহিনী। এদের এখানে দেখে তো রীতিমতো থতমত খেয়ে যান রজত বাবু। তুতলিয়ে বলেন-)
রজত বাবু - আ..প.. নারা কারা? (বলে ঢোক গেলেন)

ঝিমলি - কি রজত বাবু এদের দেখেই গলা শুকিয়ে এল। এখনও তো কিছুই বলেন নি ওনারা।

অফিসার - YOU ARE UNDER ARREST MR. RAJAT. আপনার এই নিষিদ্ধ ব্যবসা আর এই সব মহিলাদের ওপর অত্যাচার ও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের তাদের এই কাজে নিযুক্ত করার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।
(কথাটা শুনে রজত বাবু কেঁপে ওঠেন। ভাবেন - তাহলে এখানেই সব শেষ।)

ঝিমলি - কি রজত বাবু বলেছিলাম তো সময় একদিন ঘুরবে। আর তখন আপনি কেঁদে কুল পাবেন না। মিললো তো কথাটা। (মুখে জয়ের হাসি)
(রজত বাবু নিজের হয়ে আর কিছু বলেননি। হয়তো বুঝে গিয়েছিলেন আর কিছু বলেই রেহাই পাওয়া যাবে না। পুলিশ রজত বাবু সহ এই চক্রে জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। যাওয়ার আগে অফিসার ঝিমলি কে বলে ----)

অফিসার - তোমায় অনেক শুভেচ্ছা ঝিমলি। তুমি যে ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকোনি নিজের সাথে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছো তার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমায়। হ্যাঁ, হয়তো আমরা সবাই কে বলি সমস্যা হলে আমাদের কল করতে, অনেকে হয়তো ভাবে কল করবে। তবে সাহসের অভাবে তা আর হয়ে ওঠে না। তবে তুমি যে সাহস করে আমাদের এখানে ডেকেছে এর জন্য তোমায় কুর্নিশ জানাই। তোমাকে দেখে বাকি মেয়েরাও যেন রুখে দাঁড়াতে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ঝিমলি - আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি না এলে আজ ওই দোষী গুলোকে শাস্তি দিতে পারতাম না।

অফিসার - তাহলে আজ আসি। নিজের প্রতিবাদী সত্তাকে হারিয়ে ফেলো না যেনো। ভালো থেকো। (হালকা হেসে)

ঝিমলি - আপনিও ভালো থাকবেন।
(অফিসার চলে গেল। ঘরে শুধু থাকল ঝিমলি আর ওর মা বোনেরা।)

ঝিমলি - কি মা বলে ছিলাম তো শেষ হাসি টা আমরাই হাসব।

মোহিনী দেবী - হ্যাঁ,রে ঝিমলি। আমি সত্যিই আজ অনেক খুশি।

ঝিমলির বড়ো মা - সত্যিই ঝিমলি মা তুই পারলি। শেষ পর্যন্ত তুই করে দেখালি। তুই আমাদের গর্ব রে মা, আমাদের গর্ব।
(বলে ঝিমলির বড়ো মা ওকে জড়িয়ে ধরে। আর বাকি সবাই এসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে।)

অপরাজিতা

রুকসানা খাতুন

দৃশ্য-১

অমাবস্যার রাত, ঘন অন্ধকারে ঢেকে আছে চারপাশ। দূর থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁর ডাক,মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। মাটির দাওয়ায় আসন পেতে খেতে বসেছে অপরাজিতা,পাশে ওর বাবা। সামনে বসে ওর মা।

খেতে খেতে অপরাজিতার বাবা বললেন- অপা,কাল তোমার কলেজে যাওয়ার দরকার নেই।

অপরাজিতা (ভ্রু কুঁচকিয়ে) - কেন বাবা?

বাবা - কাল পাত্রপক্ষ তোমায় দেখতে আসবে।

অপরাজিতা - কিহ? বাবা, তুমি জানো আমি এখন বিয়ে করতে চাইনা, আমি পড়তে চাই।

বাবা- ভালো ছেলে, মাসিক ইনকাম ও ভালো। তাই বেশি জেদ কোরোনা।

অপরাজিতা - বাবা, আমি তোমাকে আগেও বলেছি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে আমি নিজের জীবনটা অন্যের দয়ায় কাটাতে চাইনা। আমি পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

বাবা (রাগী চোখে তাকিয়ে) - তোমার মতামত শুনতে চাইনি আমি। কাল পাত্রপক্ষ আসবে, তৈরি থেকো। আর পড়াশোনা করে হবেটা কি? জর্জ-ব্যারিস্টার হবে নাকি? ভালো করে শুনে রাখো ওসব চাকরি-বাকরি নেতা-মুন্ত্রীদের জন্য। কোনো নেতার পা না চাটলে চাকরি হবেনা।তাই এসব ফালতু চিন্তা ছেড়ে কালকের জন্য তৈরি হও।মনে রেখো তোমার জন্য যেন কোনোভাবে আমার সম্মান নষ্ট না হয়।

কথা শেষ করে খাবার ছেড়ে উঠে চলে গেলেন উনি। অপরাজিতা ওনার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

দৃশ্য-২

বারান্দায় চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে আজ, কিছুক্ষণ আগেই পাত্রপক্ষ চলে এসেছে। এখন তারা চা-জলখাবারে ব্যাস্ত। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পাত্রপক্ষের এক মহিলা বলেন- কই, মেয়েকে নিয়ে আসুন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অপরাজিতার মা ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর অপরাজিতাকে নিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হলো। পাত্রপক্ষের সামনে ওর জন্য বরাদ্দ চেয়ারে বসার পরপরই একজন জিজ্ঞাসা করল -কি নাম তোমার?

(মিষ্টি হেসে) **অপরাজিতা**- অপরাজিতা।

অন্য একজন - অপরাজিতা,বাঃ খুব ভালো নাম। কী করো তুমি?

অপরাজিতা - কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার।

কলেজে পড়ার কথা শুনেই পাত্রপক্ষের লোকজন কেমন যেন মিইয়ে গেলো।
একজন - ভালো। কিন্তু আমাদের বাড়ির মেয়ে-বৌরা কিন্তু কলেজে পড়েনা। মেয়েদের আবার বেশি পড়াশোনা করার কী দরকার? স্কুল পাশ করলেই হলো। মেয়ে মানুষের কাজ হলো রান্না করা, স্বামীর সেবা করা..., বিয়ের পর তোমাকেও কিন্তু পড়াশোনা ছাড়তে হবে।

অপরাজিতা কিছু বলার আগেই ওর বাবা বললো - ও নিয়ে আপনারা ভাববেন না। ওর নিজেরও তো পড়াশোনা করার কোনো ইচ্ছা নেই, আমরাই জোর করে.... "

আরেকজন - তা বেশ, তা বেশ। তা তুমি ঘরের কাজ পারোতো?

অপরাজিতার মা - সে কথা আপনাকে বলতে হবে না। মেয়ে আমার একদম লক্ষ্মী। ও তো সেই ছোটো থেকে বাড়ির সব কাজ পারে। রান্না করা, কাপড় কাচা কিছুতেই হারাতে পারবেন না।

নিজের মা-বাবার মুখে একের পর এক মিথ্যা শুনে হাঁপ ধরে যাচ্ছিলো অপরাজিতার। তবুও বাবার সম্মানের কথা ভেবে চুপ করে রইল। পাত্রপক্ষের একজন মহিলা এবার বললেন - তা তোমার চুলগুলো আসল তো?

খানিক বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো অপরাজিতা, বিরক্ত সুরে হাসি মিশিয়ে বললো- আপনি নিজেই দেখে নিন না।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা উঠে এসে ওর চুল নাড়াচাড়া করে দেখতে শুরু করলো। এরপর একে একে ওর গায়ের রং, হাঁটার ধরণ, উচ্চতা, হাত-পায়ের আঙুলের ধরণ সহ ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর ওকে ভেতরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেলো ও।

দৃশ্য-৩

সেদিনই বিয়েটা ঠিক হয়ে গেলো ওর। এক সপ্তাহ পর বিয়ে। অপরাজিতা , মা-বাবাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিলো যে ও বিয়েটা করবে না, কিন্তু তারা কোনো কথায় কানে তোলেনি। উপরন্তু ওর মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সাথে বাড়ির বাইরে বেরোনো সম্পূর্ণ বন্ধ।

সেদিন রাতে বিষন্ন হয়ে নিজের ঘরে বসে ছিলো ও। হঠাৎই মা-বাবার ঘর থেকে কিছু কথাবার্তার আওয়াজ শুনে কৌতুহলী হয়ে ওঠে ও। সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতে। ভেতর থেকে ভেসে আসে মায়ের চাপা স্বর, "বিয়েটা ঠিক করে কি তুমি ঠিক করলে? অপা তো একদমই রাজী নয় বিয়েতে, তাছাড়া দেনাপাওনাটাও বড্ড বেশি। "

এবার বাবার কণ্ঠে শোনা যায় - একটু বেশি তো বটে, তবে ছেলের বাড়ির দিকটাও তো দেখতে হবে। অমন বড়লোক বাড়ি, একটু তো চাহিদা থাকবেই। "

মা - তা বলে এত!

বাবা - কী যে বলো না অপার মা, এত কই? ওই তো বাইকের বদলে লাখ দুয়েক টাকা, আর মেয়ের জন্য দু'ভরি সোনার গয়না, তা সেসব তো আমাদের অপারই থাকবে।তাছাড়া অমন বড়ো লোক বাড়ির বউ হবে আমাদের অপা, এই তো অনেক।

মা- তা বটে। কিন্তু এতগুলো টাকা.....,

বাবা- তুম চিন্তা কোরোনা অপার মা, উত্তর মাঠে আমাদের যে জমিটা আছে না, ওটাই বেচে দেবো। চেয়ারম্যানের সাথে কতা হয়েছে, উনি কিনতে চান। কাল যাবো দরদাম করতে।

মা - তা বলে তুমি মেয়ের বিয়ের জন্য জমি বেচে দেবে?

দরজার সামনে থেকে সরে যায় অপা ওরফে অপরাজিতা। ও আজকের দিনের শিক্ষিত সচেতন নাগরিক, পণপ্রথার বিরোধী, আর ওর বিয়েতেই কিনা এত পণের বোঝা! আর

বাবা-সাধ্যের বাইরে গিয়ে এত টাকা পণ দিতে রাজি হলো?

ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেললো। ওর সামনে ওর সাথে এত বড় অন্যায় হচ্ছে, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে হচ্ছে, পণ দেওয়া হচ্ছে, পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে.... আর ও প্রতিবাদ করতে পারছে না? সত্যি এর থেকে বড় লজ্জার, বড় অসহায়ত্বের আর কী হতে পারে!

সাবধানে আলনা থেকে মায়ের একটা শাড়ি নেয় ও, তারপর সিলিং ফ্যানের সাথে একটা সুন্দর ফাঁস তৈরি করে নেয়। ডায়রির পাতা ছিঁড়ে একটা সুন্দর চিঠি লিখে ফেলে, তারপর চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে ফাঁসটা গলায় পড়ে নেয়।

ফাঁসটা আটকাবে তখনই চোখে পড়ে যায় বইয়ের তাকের দিকে। ওর প্রিয় লেখক, হুমায়ুন আহমেদের বেশ কতকগুলো বই সাজানো রয়েছে। আবেগী হয়ে পড়ে ও। ফাঁসির দড়ি ছেড়ে নেমে আসে বইগুলোর কাছে, শেষবারের মতো স্পর্শ করতে চায় বইগুলো। প্রিয় বইগুলো খুলে গভীর ঘ্রাণ নেয় ও। অভ্যাসবশত ওল্টাতে থাকে দু-একটা পাতাও। এভাবেই হাতে পড়ে 'অপেক্ষা ' উপন্যাসটা । প্রিয় লাইনগুলো পড়তে পড়তে পৌঁছে যায় উপন্যাসের প্রিয় একটা পাতায়, যেখানে লেখকের সৃষ্ট সুপ্রভা নামের ছোটো মেয়েটা একের পর এক মানসিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সকল পাঠকদের কাঁদিয়ে যখন আত্মঘাতী হয়,অথচ পাঠকরা আশা করে কোনো না কোনো ভাবে সুপ্রভার চরিত্র আবারও উপন্যাসে ফিরে আসবে অথচ লেখক জানিয়ে দেন, "ছোট্ট সুপ্রভা, তোমার প্রসঙ্গ অপেক্ষা উপন্যাসে আর আসবে না। কারণ তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না। মৃত মানুষদের জন্য আমরা অপেক্ষা করিনা। আমাদের সমস্ত অপেক্ষা জীবিতদের জন্য।এই চরম সত্যিটা না জেনেই তুমি হারিয়ে গেলে।"

হঠাৎ যেন আত্মোপলব্ধি হয় অপরাজিতার। মনে মনে ভাবে- সত্যিই তো, একটু আগে কী করতে যাচ্ছিলো ও? ও যদি মারা যায়, তাহলে কার কী হবে? এমন কত নারীই তো অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়, কে মনে রাখে তাদের কথা? হেরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার নাম তো জীবন নয়, বরং বেঁচে থেকে জয়ী হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোটায় জীবন। আর ওর নামই তো পরাজয় মানতে না পারা অপরাজিতা।

দৃশ্য-৪

পরদিন, বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠলো অপরাজিতা। তারপর তৈরি হয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে কলেজে চলে গেলো।

ক্লাস শেষে কলেজ ক্যান্টিনে এসে বসলো অপরাজিতা। সাথে ওর আরো তিন বন্ধু। চেয়ারে বসে তিতলি বললো - কী রে অপরাজিতা, এ'কদিন কলেজে আসিসনি কেন? শরীর খারাপ ছিলো?
মনখারাপ করে উত্তর দিলো অপরাজিতা-না রে !

অনন্যা বললো- কী রে মনখারাপ কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে?

অপরাজিতা- আর বলিস না। আমার যা সমস্যা! তোরা তো জানিস বাবা একদমই চায়না আমি পড়াশোনা করি।আবার একটা বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন উনি। আর বিয়েটাও ফাইনাল করে ফেলেছেন।

তিতলি - সে কী! তুই তোর বাবাকে বলিসনি তুই এখন বিয়ে করতে চাস না।

অপরাজিতা - বলিনি আবার, বাবা শুনলে তো!

অনন্যা - তাহলে কী করবি এখন? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করে নিবি?
অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো অপরাজিতা। তিতলি ওকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললো - কী ভাবছিস?
চমকে উঠলো অপরাজিতা। তারপর বললো - বিয়ে আমি করবনা কিন্তু ভাবছি যদি পড়াশোনা করার পর কোনো জব না পাই তাহলে বাবার সামনে মুখ দেখাব কী করে?

অনন্যা - এত নেগেটিভ চিন্তা কেন করছিস? আজকের আধুনিক যুগে এত এত জব অপারচুনিটি , চেষ্টা করলে কিছু না কিছু পেয়েই যাবি।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলো অর্ণব। এবার বললো- তাছাড়া তুই পড়াশোনার পাশাপাশি জব এক্সামের জন্যও প্রিপারেশন নিতে পারিস। এতে তোর আরো সুবিধা হবে।

অপরাজিতা- ব্যাপারটা আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু সম্ভব নয়।

অর্ণব- কেন?

অপরাজিতা- এক্সামের প্রিপারেশন নিতে হলে নোটসের জন্য তো টিউশন দরকার। কিন্তু এত খরচ টানা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তোরা তো জানিস আমি টিউশনি করেই পড়ার খরচ চালায়। তাতে যা পাই এতকিছুর খরচ অসম্ভব।

(কিছুক্ষণ নীরবতার পর)**অর্ণব** বললো- যদি তুই চাস তো আমি তোকে হেল্প করতে পারি।

অপরাজিতা - তুই? কীভাবে?

অর্ণব - আমিও তো জবের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। তুই চাইলে আমি তোকে নোটস দিতে পারি।

তিতলি- বেশ তো। অর্ণব, তুই তাহলে ওকে সাহায্য কর।

অনন্যা- হ্যাঁ, অপরাজিতা, এটা তোর জন্য একটা ভালো চান্স।

অপরাজিতা- থ্যাংক ইউ অর্ণব। অনেক থ্যাংকস তোদের। সত্যি তোদের মতো বন্ধু পেয়ে নিজেকে খুব লাকি মনে হয়।

অর্ণব- ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ধন্যবাদ দিতে হবে না। এবার একটু হাস তো। সেই সকাল থেকে মুখ গোমড়া করে বসে আছিস।

অর্ণবের কথায় মুচকি হাসলো অপরাজিতা। বাকি বন্ধুদের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

দৃশ্য-৫

পড়ার টেবিলে বসে আছে অপরাজিতা। রেগেমেগে ঘরে ঢুকলেন ওর বাবা, পিছনে ওর মা, ভয়ার্ত মুখ।
বাবাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো অপরাজিতা। ওর বাবা এসে সপাটে ওর গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে রাগে চিৎকার করে বললেন -কোন সাহসে তুমি আমার আদেশ অমান্য করে কলেজে গিয়েছিলে? তোমাকে তো বারণ করা হয়েছিল। নিজেকে কি অনেক বড় কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছ নাকি? একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো, আজ থেকে তুমি এ ঘরেই বন্দী হয়ে থাকবে, একেবারে বিয়ের দিন এঘর থেকে বেরোবে।

গালে হাত রেখেই বাবার চোখে চোখ রাখলো অপরাজিতা। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললো - আমারও তোমাকে কিছু বলার আছে বাবা। নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত বিয়ে আমি করবনা। আমি আগেও জানিয়েছি, এখনও বলছি। এরপরও যদি তুমি আমার বিয়ের বন্দোবস্ত করো, করতেই পারো। কিন্তু ভরা সমাজে যদি তুমি অপমানিত হও, তাহলে তার জন্য শুধু তুমি দায়ী থাকবে, আমি নই।

আবারও চড় মারার জন্য হাত তুললো অপরাজিতার বাবা, ওর মা ওনাকে আটকে দিয়ে বললো- এভাবে সোমত্ত মেয়ের গায়ে হাত তুলো না।

বাবা (চিৎকার করে) - ওকে বোঝাও। এই বিয়ে ওকে করতে হবে। এত ভালো সম্বন্ধ এসেছে যে ওর ভাগ্যের ভাগ্য ভালো।

অপরাজিতা (ব্যাঙ্গাত্মক হেসে) - ভালো সম্বন্ধ? কোথায় ভালো সম্বন্ধ বাবা? ওই বাড়ি আর চাকরি? এটা তোমার কাছে ভালো সম্বন্ধ হতে পারে, আমার কাছে নয়। যে বাড়ির মানুষরা উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পরও বলে বাড়ির বউদের পড়াশোনা শেখার দরকার নেই, মেয়েদের ইনকাম করার দরকার নেই, আর তার থেকেও বড় কথা জেনেশুনে অমানুষের মতো বিয়ের বিনিময়ে পণের বোঝা চাপিয়ে দেয়, আর যাইহোক সেই সম্বন্ধ কে আমি অন্তত ভাগ্যবান বলব না, বরং লজ্জার। আমি এতোটাও ফেলনা নই যে এত টাকা পণ দিয়ে, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা , আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনো মনুষ্যত্বহীন ছেলেকে বিয়ে করব।

কিছু বলতে যাচ্ছিলো অপরাজিতার মা,তার আগেই চিৎকার করে উঠলো ওর বাবা- দেখলে,আস্পর্ধাটা একবার দেখলে।কেমন মুখে মুখে চোপা করছে! এই জন্য বলেছিলাম, কলেজে ভর্তি না করতে।সব তোমার জন্য হয়েছে।

অপরাজিতা- একদম ঠিক বলেছ বাবা। সব মায়ের জন্যই হয়েছে। ছোটো থেকে যদি মাকে তোমার দ্বারা নির্যাতিত হতে না দেখতাম, তাহলে আমার মধ্যে কখোনোই স্বাধীন হওয়ার বোধ জাগত না।

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন অপরাজিতার মা। তাকে বলার সুযোগ না দিয়ে অপরাজিতা বললো- আরেকটা কথা, বিয়ে তো আমি করব না। এবার তুমি বলতেই পারো, এ বাড়িতে আমার কোনো জায়গা নেই, আমি তোমাদের কাছে মরে গেছি, বলতেই পারো, সমস্যা নেই। প্রয়োজন হলে এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে হোস্টেলে থাকবো, পার্টটাইম জব করবো কিন্তু বিয়ে আমি করবনা। এবার তুমি যা খুশি করতে পারো, আমার কিচ্ছু যায় আসেনা। কিন্তু বিয়ে আমি করবনা।

দৃশ্য -৬

বছর দুয়েক পর,
সেদিনের পর কেটে গেছে বছর দুয়েক। ইতিমধ্যে গ্রাজুয়েশন কম্পিলিট হয়েছে অপরাজিতার।সেদিনের পর ওর বিয়ের জন্য আর কোনো সম্বন্ধ না আনলেও আজও বাবার সাথে সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয়। অর্ণব ওর কথা রেখেছে, এই দুবছরে অনেক সাহায্য করেছে অপরাজিতাকে।অপরাজিতাও হাল ছাড়েনি, জান-প্রাণ লড়িয়ে পরিশ্রম করে গেছে। টিউশনি করিয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি একাগ্রতার সহিত পড়াশোনা করে গেছে। একের পর এক সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসে বেশ অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে ও। আজ তেমনই একটা সরকারি চাকরির পরীক্ষার ইন্টারভিউ ছিলো।

ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফিরতে বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেলো। বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে মোবাইলটা অন করেই ও ইমেইল-এ একটা নোটিফিকেশন দেখতে পেলো। ম্যাসেজটা অপেন করে দেখলো, তাতে লেখা - কনগ্রাচুলেশন মিস অপরাজিতা, ইউ আর সিলেক্টেড ফ্রম ডব্লিউ.বি.পি.এস.সি অ্যাজ আ জুনিয়র সব ইন্সপেক্টর।

ম্যাসেজটা দেখে ও প্রথমে অবাক হয়ে বসে রইলো,আনন্দে ও শব্দহীন হয়ে পড়লো। তারপর আনন্দে কেঁদে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলো ও ,ওর বন্ধুদের। যাদের সাহায্য ছাড়া এতদূর পৌঁছানো ওর পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হতোনা।

দৃশ্য-৭

কয়েকদিন পর,
আজ থেকে অপরাজিতার ডিউটি শুরু। বাড়ি কয়েক কিলোমিটার দূরে ওর অফিস। প্রথম দিন হওয়ায় সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিলো ও। তারপর বেরোনোর আগে বাবার কাছে গেলো। উঠোনে বসে রোদ পোহাচ্ছিলো ওর বাবা, শরীরটা ক'দিন ধরেই বেশ খারাপ। অপরাজিতা ওনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

জয়েনিং লেটারটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো - বাবা, আমি জানি, নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি তোমার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি, তোমার অনেক খারাপ লেগেছে, আমার ব্যাবহার তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, আর সব বুঝেও একই আচরণ আমি বারবার করেছি, এসবকিছুর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি বাবা। তুমি পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

একটু থেমে আবার বললো ও- বাবা, তোমার কথামত জর্জ -ব্যারিস্টার হতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ঠিকই, তবে যেটা আমার পক্ষে সম্ভব তেমনই একটা সাধারণ চাকরি আমি ভগবানের আশীর্বাদে পেয়েছি। আজ আমার চাকরিতে প্রথম দিন, আমাকে আশির্বাদ কোরো বাবা।

কথা শেষ করে ওনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো অপরাজিতা, বাঁধা দিলেন না উনি, তবে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখালেন না। দীর্ঘদিনের মান-অভিমান, ইগোর লড়াই কাটতে সময় লাগবে নিশ্চয়ই। আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেলো অপরাজিতা। বাড়ির চৌকাঠ পেরোনোর সময় যদি একটিবার পিছন ঘুরে তাকাত ও, তাহলে দেখতে পেতো, দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে উনি বলছেন, "দুর্গা, দুর্গা। " চোখের কোণে চিকচিক করছে জলকণা।

YELLOW IN THE BLUES

ANKANIKA SADHUKHAN

Characters:
Kathika, a victim of domestic violence and the mother of an infant
Shruti, the infant of 7 months
Anirudh, Kathika's husband and abuser and Shruti's father
Bithika, Kathika's elder sister
Kathika's therapist
Sharma family (mentions are made but characters do not actively participate)

Scene 1

Setting:
An old, depressing 2bhk flat

Time:
At present

(Kathika wakes up from a nightmare, sweating profusely and taking deep breaths. Little Shruti sensing her mother's fear, starts crying. Kathika picks up Shruti from her place in bed and starts cooing with sweet nothings.)

Kathika: No no, Mummy's here, right? No one can hurt you. I love you. Nothing is going to go wrong.

(Kathika hugs Shruti as closely as she can and cuddles with her for some time. Gradually, Shruti's whimpers die down.)

Kathika: That's my girl. My brave, sweet girl.

(Kathika kisses Shruti on her forehead. Bithika, Kathika's elder sister enters.)

Bithika: Good morning, Katha! Good to see you are up already. And oh! My Shruti is also awake!

Bithika rushes to Shruti and takes her from Kathika. Shruti happily goes to her aunt's arms. Kathika smiles warmly at them.)

Bithika: Hey Katha, I need to fetch a few things from the market before going to the office. Would you mind if I steal Shruti for a few minutes? I promise I won't be late. I will just run to the market real fast and come back just as soon!

Kathika: Yes, sure. Take her. But don't you be late? I have yet to feed her.

Bithika: Don't worry. You'll have your daughter back in no time. Bye!

(With this, Bithika takes her leave from the spot with Shruti in her arms. Kathika closes the door after her and settles in the kitchen. She starts cooking. After a while, she hears the doorbell ringing. Kathika rushes to the door and looks into the peephole of the door and finds out a very familiar face. A face so familiar and yet she wants to forget it; the face which is the cause of her endless nights and frequent nightmares. It is Anirudh on the other side, Kathika's husband. For the past three years, Kathika has been nothing but a perfect "trophy wife" to him, yet Anirudh as the monster he is, put her through constant torture and made Kathika's world a living purgatory. Kathika gasps at the sight of him.)

Kathika: No, no..this can't be happening..he can't be here..how? How is it even possible?!! Bithi-Bithika!!! Where are you? Bithika???

(Kathika sees the door knob turning.)

Anirudh: Kathika, Kathika! Let me come in. Open the door, you bitch. I swear if I get my hands on you, I will show how it is to disregard me.

(She quickly pulls up every latch at the door and runs to bring the lock. Anirudh's thunderous voice looms through the small flat and he bangs the door even louder. The noise is getting too much unbearable.)

Anirudh: I'm telling you one more time. You better open it! Or, I will break it.

(Shivering and fumbling with the keys, the lock falls off from Kathika's hand. She sits to pick it up but it is too late. Anirudh's attempt at breaking the door has succeeded. Now his tall, stout stature hovers over Kathika as she looks up to him. His eyes are ablaze with cold fire.)

Anirudh: Wow, Katha. I'm surprised at your outrageous audacity. You dare to disobey? You didn't let me come in.

(Anirudh sits down where Kathika is sitting and smiles coldly.)

Anirudh: You can assume what the consequences may be, right? To disobey me-

Kathika: Li-listen to me, Anirudh. I-I-

Anirudh: You dare talk back?

(Anirudh strikes Kathika with all his strength and her head bangs against the threshold. Kathika loses her consciousness.)

Scene 2

Setting: Kathika's bedroom

(Kathika opens her eyes slowly to find her small room floating over her. She closes her eyes again. Shruti babbles in the background. Her babbling draws Kathika's attention.)

Kathika: My baby, my Shruti! Please don't hurt her. She's your baby too, Anirudh! Please leave her-

Bithika: Katha, Katha!! It's me, Bithika! You're safe. Please calm down.

(Kathika now looks properly around her bedroom and finds Bithika, Shruti and the face of her therapist zooming through her face in a concerned manner.)

Kathika: Wh-what happened?

Bithika: You're safe, Katha. Don't worry. Shruti is safe too. Anirudh didn't come. He's still in jail.

Kathika: Oh. I- So, did I again-

Kathika's therapist: Yes, Kathika. You're right if you're assuming you were hallucinating again.

Bithika: Apparently, you had a panic attack and the Sharmas next door heard your screams. They broke in because there was no other way. And you somehow banged your head against the threshold and lost your senses. Mrs. Sharma called in the doctor and gave me a call. You had been unconscious for a while.

Kathika: Ohh..that..that..makes sense now. But now-

Kathika's therapist: No buts, Kathika. You'll be fine. I'm here, right? Just take you medicines and there's no need to worry.

(Kathika's therapist warmly smiles at her and looks at Shruti.)

Kathika's therapist: Look at your baby. How happy she is to see her mumma again! You can be all right, Kathika. You have to be..for yourself and for Shruti. You're still the brave girl who fought against that scoundrel and put him in jail!

(Kathika looks at her baby. Her tiny face gives Kathika an enormous amount of hope. She takes Shruti in her arms and kisses her forehead. Shruti giggles.)

Kathika: I will give you a happy life, Shruti. A very happy life!

(The curtain closes.)

THE TALE OF A WILTED ROSE AND A LETTER

SAMADRITA NANDY

Characters: Sunanda, Nandini, Nandini's mother.

Scene 1

[Our main character, Sunanda, 34, Female, was walking the commodities markets
Her mood was decently normal even though she sighed once or twice. The inflation of the economy! While managing her black dupatta, she accidentally bumped into someone.]

Sunanda- *pretty much annoyed now* একটু দেখেও কি চলতে পারেন না... (can't you walk carefully?) *Stunned* নন্দিনী ?

[Nandini, the childhood best friend of Sunanda. Also 34. Wearing normal jeans and a top. She is standing in front of Sunanda]

Nandini- Hey! Long time no see! কেমন আছিস্? (How are you?) *Her face was radiant with a smile*

Sunanda- *her eyes glazed as if she couldn't believe*

Nandini- ..Bro? Oi? *She snapped her fingers in front of Sunanda's face*

Sunanda- *the snap brought her back to reality* হুম ... তুই কবে ফিরেছিস্? (When did you return?)

Nandini- এই তো দুদিন আগে। মা বলল বাজার থেকে হলুদ আনতে, so .... (Two days back. Mom asked me to bring some turmeric, so...)

Sunanda- *kept on staring but couldn't focus much on Nandini's words* ও! আসিস্ একদিন জিজু কে নিয়ে (oh! Come home then with your husband.) *the mention of it suppressing her tone as if she doesn't desire so*

Nandini - Nah! He stayed back in London. Didn't get his off, you know. And no worries! I will visit you someday. Have to catch up with you!

Sunanda- Right. Um, excuse me. I gotta go. See ya! *She smiles and walks from there*
[Sunanda's frantic state of mind did not match her poker face. She steadily walks out]

Scene 2

Sunanda is sitting at her study table. Unusual for her, it's messy and disorganised. Her expressions are solemn. In her hand, the audience can see a withered rose and a yellow-tinted paper. Frail like an old man and crinkled as if fisted onto. Sunanda breathed heavily. Her thoughts, were deranged.

[The scene changes to the same room but a bit newer with a more girlish charm.]

__Flashback begins__

Sunanda seems slightly younger. 24. Jovial. Extremely flamboyant for some reason which we will get to know now.

Sunanda - *wearing her best, twirls in her red and white salwar kameez* Oh God, I am in love! How did I not understand the telltale signs of it!

She giggles and walks back and forth her room

Her eyes, oh lord! Her eyes. এত সুন্দর কোনো মানুষ হতে পারে? (Can someone be this beautiful?)

She rubs her lips with a tinge of red lip balm

আজ সব বলে দেব! আমি আর যে এই টান নিতে পারছি না ! (I will say everything. I can't take it anymore!)

এই চিঠি....(This letter) I just hope my words help me today. I hope my pen can announce my heart's beat.
Sunanda runs out with her purse.

[**The scene changes to her running in sandals, as she walks past the flower market, she stops]**

গোলাপ তো ওর favourite। একটা কেনা উচিত। (Rose is her favourite. I should buy one.)

She purchases one rose and continues to run. The smile on her face matched the radiance of the Sun

Soon, she reaches the house of her beloved.

Scene 3

Her feet stopped but she got confused. Why were there so many shoes outside the door? Raising her eyebrows, she walked inside. She was stunned to see so many people in the living room.

Her beloved's mom- আরে সুনন্দা! আয় আয়! এ হলো গিয়ে আমার মেয়ের ছোটবেলাকার বান্ধবী। একসঙ্গেই বড় হয়েছে। (Arey Sunanda. Come come. This is my daughter's childhood friend. They have grown together) *Introducing her to the guests which made Sunanda awkwardly nod and do a namaste* একটু নন্দিনী কে নিচে নিয়ে আয় তো মা। (Bring Nandini downstairs, please)

Sunanda- *dread on her face* o-okay..

She walks faster, the map of this house imprinted on her brain. Soon she stood out in front of the bedroom Nandini! *She called out from outside.*

Nandini- Sunu? দাঁড়া! খুলছি! (Wait! I am opening the door) *The door was opened, revealing a saree clad Nandini* তোকে সকাল থেকে খুঁজছি- (I am looking for you since morning)

Sunanda- *interrupting her* কারা এসছেন এরা? কে? তুই..তুই শাড়ী পড়েছিস কেনো!? (Who are these people? Why are you wearing a saree?)

Nandini- oof! Wait na! ভেতরে আয়ে! (Come inside)*She drags her in* কেমন দেখলি ছেলেটা কে? ভালো দেখতে? (How does the guy look? Handsome?) *She nervously giggled*

Sunanda- ... তোকে দেখতে এসছে?? তুই আমায় আগে বলিসনি কেনো!? (They have come to ask for your hand? Why didn't you tell me!?)

She purchases onNandini- তুই এমনিও জানতে পারতিস. (You would have known either way) We have a soul connection. See! তোকে না বললেও এসে গেছিস তুই!
(I didn't even have to tell you but here you are!)

*__Sunanda-__ that's not- whatever. মা ডাকছে তোকে। যা নিচে, just go. (mom is calling you. Go down) *Her voice helpless, laced with desperation and anger*

Nandini- *recognised the tone* you okay?

Sunanda - Just go, Nandini! Just...go now. I'll sit here.

Nandini- if you say so.

Nandini climbs downstairs carefully, not yet habituated in wearing sarees

Sunanda- *her eyes welled up* why... *She whispers to herself* oh why.. *she gulps down the knot in her throat or rather tried to*

I can't let her know. She obviously doesn't love me.. *all her enthusiasm gone by then*

She dabbed her eyes with her red dupatta

The letter stayed inside her purse.

Flashback ends

Scene 4

Sunanda, now older and wiser, sits on the same study table where she first wrote the letter.

Sunanda- নন্দিনী... তুই ফিরে এসছিস যদিও... জানি না, তোকে বলা উচিত হবে কিনা। আমার দোষ ছিল বেশি। I fell in love with my best friend *she sighs* (Nandini, even if you have returned..I don't know whether it will be good to tell you. I was at fault more than you were)

I am just hoping, I can forget the young Nandini whom I fell in love with. I have to embrace the older Nandini who's happily married. জানি না, পারবো কিনা। (I don't know whether I can)

সাতদিন

রূপা সাহা

চরিত্রলিপি:
বর্ণালী বিশ্বাস
সমাপ্তি বিশ্বাস (বর্ণালী বিশ্বাসের মা)
রাজিয়া খাতুন
আমিনা বিবি (রাজিয়া খাতুনের আম্মা)
সাথীপর্ণা সরদার
সুমাইয়া পারভিন
সুজয় পোদ্দার (কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার)
রাখী ঘোষ (কলেজের অধ্যাপিকা)

প্রথম দৃশ্য

[নাটকটি শুরু হয় বর্ণালী বিশ্বাস ও তার মা সমাপ্তি বিশ্বাসের কথোপকথন দিয়ে। পর্দা খুললে দেখা যায় মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন বর্ণালী বিশ্বাস ও তার মা সমাপ্তি বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে]

বর্ণালী :মা আমাকে কিছু টাকা দাও।

বর্ণালীর মা :কেন রে? সকাল সকাল টাকা কি কাজে লাগবে তোর?

বর্ণালী : (স্বাভাবিক গলার আওয়াজে) দোকানে যাব মা, প্যাড কিনতে।

বর্ণালীর মা : (বর্ণালীর মুখ চেপে ধরে, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে)ওরে আস্তে আস্তে। এত জোরে চিৎকার করছিস কেন?এগুলো কি জোরে বলার বিষয়? বাড়িতে ছেলেরা সবাই রয়েছে তার মধ্যে উনি মাইক বাজিয়ে দিলেন। মন দিয়ে শুনে রাখ একটা কথা এরপর থেকে এই বিষয়ে কিছু বলতে হলে কানে কানে এসে চুপিচুপি বলবি।

বর্ণালী :এতে এতো লুকোচুরির কি আছে মা?এটা তো একটা স্বাভাবিক ঘটনা। প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই একটা নির্দিষ্ট সময় এই জিনিসটা আসে। কিন্তু তুমি তো এমন ভাবে বলছো যেন এটা হওয়া মানে অপরাধী হয়ে যাওয়া।

বর্ণালীর মা : (রেগে গিয়ে) নাও শুরু হলো সকাল সকাল মেয়ের জ্ঞানের ভান্ডার। শোন যা বুঝিস না তা নিয়ে অযথা তর্ক করিস না। এই বিষয় নিয়ে আমি আর কোন কথাই এগোতে চাই না। বিষয়টা এখানেই বন্ধ হোক।

[বর্ণালীর শারীরিক কষ্ট হওয়ায় সে আর মায়ের কথাকে দীর্ঘায়িত করেনা, তার চোখে মুখে কষ্ট ফুটে ওঠে]

বর্ণালী : (পেটে হাত দিয়ে) আচ্ছা তুমি আমায় টাকাটা দাও এখন।

[আঁচলের খুঁট থেকে কিছু টাকা বের করে বর্ণালীর মা, বর্ণালী কে দেয়]

বর্ণালীর মা : এই নে টাকা আর শোন দোকানে গিয়ে আবার সবার সামনে চিৎকার করে বলিস না।যখন দেখবি দোকান ফাঁকা তখন আস্তে আস্তে গিয়ে বলবি প্যাড লাগবে। তারপর কেনা হয়ে গেলে কালো প্যাকেটে করে ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে আসবি কেউ যেন দেখতে না পায়।

[বর্ণালী তার মায়ের কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে চলে যায়]

[মঞ্চ খালি হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় বর্ণালী একটা ব্যাগ হাতে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে]

বর্ণালী : মা,ওমা।

[বর্ণালীর মা মঞ্চে উপস্থিত হয়]

বর্ণালীর মা : হ্যাঁ বল ডাকছিস কেন?

বর্ণালী : জানো মা কিছু টাকা বেঁচে গিয়েছিল আর দেখো তাই দিয়ে আমি কি কিনে এনেছি।

বর্ণালীর মা : কি কিনে আনলি আবার?

বর্ণালী : (ব্যাগের মুখ খুলে ব্যাগের ভিতর দিক মাকে দেখিয়ে) এই দেখো মা, কাল তো ভাইফোঁটা, তাই আমি ভাইফোঁটার বাজার করে এনেছি।

বর্ণালীর মা : (প্রচন্ড রেগে গিয়ে) ওরে অলক্ষুণে, অপয়া মেয়ে তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস? এই সময় তুই এসব ছুলি?

বর্ণালী : (অবাক হয়ে) কেন মা কি হলো?

বর্ণালীর মা : আচ্ছা তুই কি জানিস না তোর কি হয়েছে? এই সময় তুই তোর ভাইকে ফোঁটা দিবি? মাথা কি পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে? শুনে রাখ আমার পরিষ্কার কথা এ বছর কোন ভাই ফোঁটা হবে না।

বর্ণালী :এ তুমি কি বলছো মা? ভাইফোঁটা হবে না!কিন্তু কেন?

বর্ণালীর মা : তুই কি চাস বলতো তোর ভাইয়ের অমঙ্গল হোক?অকল্যাণ হোক?

বর্ণালী :এরকম কথা কেন বলছো মা? ভাইফোঁটা তো ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়, তাহলে অমঙ্গল অকল্যাণ কেন হবে?

বর্ণালীর মা : বোকাদের মত কথা বলিস না বর্ণালী। মাসের এই সাত দিন মেয়েদের কোন শুভ কাজে অংশগ্রহণ করতে নেই, না হলে পাপ হয়। এই সাত দিন মেয়েরা অপবিত্র থাকে, তাই তাদের দ্বারা কোন শুভ কাজ হতে পারে না।এই কথাগুলো কি তোর জানা নেই? বড়ো হচ্ছিস বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা কর।এরপর তো লোকে ছিঃ ছিঃ করে যাবে বাড়ি এসে।

বর্ণালী :কিন্তু মা!

বর্ণালীর মা : কোনো কিন্তু নয়। আর একটা কথাও আমি শুনতে চাই না। আমি যখন বলেছি তুই এ বছর ভাইফোঁটা দিবি না, তার মানে দিবি না। এখন যা এখান থেকে আমাকে আর বিরক্ত করিস না। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

[বর্ণালী তার মায়ের কথা শুনে খুবই কষ্ট পায়। সে আর কোন কথা বাড়ায় না।বাজারের ব্যাগটা ওখানেই রেখে দিয়ে শুধু ব্যাগ থেকে একটা কালো প্যাকেট বার করে নিয়ে মঞ্চ থেকে চলে যায়]

[এরপর বাজারের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বর্ণালীর মা-ও মঞ্চথেকে নেমে যায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাজিয়া খাতুন হাতে একটি জায়নামাজ নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে]

রাজিয়া :আম্মা আমি নামাজ পড়তে বসলাম।

[দৌড়াতে দৌড়াতে মঞ্চে উপস্থিত হয় রাজিয়া খাতুনের আম্মা আমিনা বিবি]

রাজিয়ার আম্মা : (রেগে গিয়ে রাজিয়ার হাত থেকে জায়নামাজ কেড়ে নিয়ে) ছাড় ছাড়। খবরদার বলে দিলাম এই সাতদিন জায়নামাজ স্পর্শ করবি না আর নামাজ পড়ার তো কোনো প্রশ্নই উঠছে না।

রাজিয়া :তুমি প্রত্যেক মাসের এই সাতদিন করে আমায় নামাজ পড়তে দাও না কেন বলতো আম্মা?

রাজিয়ার আম্মা :কেন জানিস না? এই সময় আমাদের শরীর নোংরা থাকে, আর এই অপরিষ্কার শরীরে কখনো নামাজ পড়তে নেই, নাহলে পাপ হয়। আর আজ তুই এই নোংরা শরীর নিয়ে জায়নামাজ স্পর্শ করলি, না জানি কি বিপদ হতে চলেছে।

রাজিয়া :ধুর তুমি যে কি বলো না আম্মা। বিপদ কেন হতে যাবে?

রাজিয়ার আম্মা :এই সময় আল্লাহর নাম অবধি মুখে উচ্চারণ করতে নেই নাহলে আল্লাহ প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন। আর সেখানে তুই জায়নামাজ স্পর্শ করেছিস।বলি তাহলে বিপদ হবে নাতো আর কি হবে?

রাজিয়া :মোটেই না। আল্লাহ অভিশাপ কেন দেবেন? মেয়েদের জীবনের প্রত্যেক মাসের এই সাতদিন তো আল্লাহর-ই সৃষ্টি, তবে নিজের সৃষ্টিকে আল্লাহ কেন অভিশাপ দেবেন? তুমি না কিছুই জানো না আম্মা, যতোসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করো।

রাজিয়ার আম্মা : (প্রচন্ড রেগে গিয়ে রাজিয়ার গালে একটা চড় মারলেন) তবে রে! তুই বেশি বুঝে গেছিস সব কিছু? এক্ষুনই যা এখান থেকে, তোর কোন বাড়তি কথা শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

[**রাজিয়া** চড় খাওয়া গালে হাত দিয়ে মায়ের উপর প্রচন্ড রাগ দেখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চ থেকে চলে যায়]

[রাজিয়ার আম্মাও মেয়ের আচরণে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে মঞ্চ থেকে চলে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

[তৃতীয় দৃশ্যে একটি কলেজের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা হয়।দেখা যায় মঞ্চে কতগুলি বেঞ্চ রাখা রয়েছে, যেখানে দুটি বেঞ্চে মুখোমুখি বসে আছেন রাজিয়া খাতুন, বর্নালী বিশ্বাস এবং তাদের আরো দুই বান্ধবী সাথীপর্ণা সরদার ও সুমাইয়া পারভিন।]

সাথীপর্ণা :কিরে বর্ণালী মুড অফ কেন তোর? অন্যদিন তো আমাদের কাউকে কথাই বলতে দিস না। আর আজ যে একেবারে কুলুপ এঁটেছিস মুখে, ব্যাপার কি?

বর্ণালী : আসলে, জানিস এবার আমি আর ভাইকে ফোঁটা দিতে পারবো না।

সুমাইয়া : এমা কেন?

বর্ণালী : কেন আবার, ওই আমাদের মেয়েদের সাতদিনের লড়াই। এ মাসে ভাইফোঁটার মধ্যেই হতে হল আর কি। তাই মা বলেছে এবার ভাইকে ফোঁটা না দিতে না হলে নাকি ভাইয়ের অকল্যাণ হবে।

সাথীপর্ণা : হ্যাঁ রে, আমার মা-ও তাই বলে। এইতো এবার আমি সরস্বতী পূজোয় অঞ্জলি দিতে পারিনি। মা বলে এই সাত দিন নাকি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতে নেই, ঠাকুরের মূর্তিকে স্পর্শ করতে নেই, পুজো করতে নেই, এমন কি কোন শুভ কাজেও অংশগ্রহণ করতে নেই, নাহলে নাকি পাপ হয়।

রাজিয়া : আজ জানিস আমার আম্মাও আমাকে ভোরের নামাজ পড়তে দেয়নি। আম্মা বলে এই সাতদিন নাকি আমরা নোংরা থাকি তাই আল্লাহর নাম করতে নেই, নামাজ-ও পড়তে নেই এমন কি জায়নামাজ স্পর্শ পর্যন্ত করা যায় না, এতে নাকি আল্লাহ অভিশাপ দেন।

সুমাইয়া : একদম আমার আম্মা-ও একই কথা বলে। আমাকে ওই সাত দিন নামাজ পড়তে দেয় না। তারপর রমজানের মাসে ওই সাতদিন রোজাও রাখতে দেয় না।এইতো গতবার ঈদে আমি নামাজ পড়তে পারিনি, খুব মন খারাপ হয়েছিল আমার।

বর্ণালী : জানিস আমার বোন সুদিতি একদিন তেঁতুলের আচার খেতে গিয়েছিল ওমনি বোনের হাত থেকে আচারটা কেড়ে নিয়ে মা বলল যে এই সময় নাকি টক খেতে নেই, কিন্তু জানিস রিয়ার কাকা ডাক্তার, রিয়া ওর কাকাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এই বিষয়ে, তখন ওর কাকা বলেছেন চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, এগুলো কেবল কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাজিয়া : এইতো গত মাসে আমি বেশকিছু ফুলগাছ লাগিয়ে ছিলাম। কিন্তু ওই সাতদিন আম্মা আমায় গাছ স্পর্শ করতে দেয়নি, গাছে জলও দিতে দেয়নি। এখন আর ওই গাছগুলো বেঁচে নেই। সেইবার আমার খুব কষ্ট হয়েছিল।

সাথীপর্ণা : আচ্ছা তোদের কি মনে হয় আমাদের সমাজে মেয়েদের জীবনের এই সাতটা দিন কে নিয়ে যে রীতি-নীতি গুলো প্রচলিত আছে, সেগুলো কি আদৌ সত্যি নাকি নিছকই কুসংস্কার?

সুমাইয়া : আমার তো এগুলোকে কুসংস্কারের থেকে বেশি আর কিছুই মনে হয় না।

বর্ণালী : একটা কথা বল তোরা আমরা কি সমাজ থেকে আমাদের এই সাতদিন কে নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার গুলোকে দূর করার জন্য কিছুই করতে পারি না?

সাথীপর্ণা : আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে।আচ্ছা আমরা যদি আমাদের কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের এ বিষয়ে জানাই এবং তাঁদেরকে যদি অনুরোধ করি যে আমাদের সমাজের মানুষজনদের মধ্যে থেকে এই কুসংস্কার দূর করার জন্য আমাদের অভিভাবক অভিভাবকের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য, যাতে সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এই সাতদিনের পরাধীনতা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি।

সুমাইয়া :বাহ্! বেশ দারুণ পরিকল্পনা করেছিস তো।

বর্ণালী :তুই একদম ঠিক বলেছিস সাথীপর্ণা।

রাজিয়া :এই অনুষ্ঠানটা হলে শুধু আমাদের জন্য নয় সকলের জন্যই খুব ভালো হবে।

সাথীপর্ণা :চল এখন তাহলে যাওয়া যাক।

[এরপর ওরা চারজনে খুব আনন্দিত মনে মঞ্চ থেকে চলে যায়।]

চতুর্থ দৃশ্য

[পরের দিন দেখা যায় সত্যি সত্যিই কলেজে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঞ্চের দুইদিকে কিছু কিছু করে বেঞ্চ রাখা রয়েছে। একদিকে বসে আছেন অভিভাবক-অভিভাবিকারা অন্যদিকে বসে আছেন ছাত্রছাত্রীরা।মাঝখানে কিছু চেয়ার রয়েছে, চেয়ারে অধ্যাপক-অধ্যাপকিরা বসে আছেন। প্রথমে মাইকের সামনে উপস্থিত হয়েছেন প্রিন্সিপাল স্যার সুজয় পোদ্দার।]

প্রিন্সিপাল স্যার: এখানে উপস্থিত আপনারা সকলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে আজ আমরা সকলে এখানে কেন একত্রিত হয়েছি। আমি কারুর নাম উল্লেখ করছি না, তবে আমাদের কলেজেরই কিছু ছাত্রী তাদের জীবনের কিছু জটিল সমস্যা কে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছে, যা সমাধানের জন্যই আজ আমাদের এই অনুষ্ঠান। আমি আর বেশি কিছুই বলবো না, যা বলার বলবেন আমাদেরই কলেজের অধ্যাপিকা রাখী ঘোষ। আমি অধ্যাপিকা রাখী ঘোষ কে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি।

[দেখা যায় মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপিকা রাখী ঘোষ। প্রিন্সিপাল স্যার সুজয় পোদ্দার তাঁর হাতে মাইক তুলে দিয়ে নিজে চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েন।]

অধ্যাপিকা : (হাসিমুখে) আমি প্রথমেই আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনারা যে আমাদের অনুষ্ঠানে আজ উপস্থিত হয়েছেন, তা দেখে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে।আমি আজ যে বিষয় নিয়ে কথা বলব সেটা একজন মেয়ের শোনা যেমন জরুরী তেমনি একজন ছেলের-ও শোনা ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই কম বেশি জানি যে একটা বয়সের পর মেয়েদের জীবনে প্রতি মাসে সাতদিন করে একটা অধ্যায় আসে। আমাদের সমাজে মেয়েদের এই সাতটা দিন কে নিয়ে যে বহু প্রচলিত কুসংস্কার গুলি আছে তার বাস্তব ভিত্তি কতটা তা নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব। দেখুন আমরা বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বাড়ির ছোটদের এই সময় নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলি।এরপর তারা যখন বড়ো হয় তখন তারাও তাদের থেকে ছোটদের সেই বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করে দেয়, এভাবেই চলতে থাকে।প্রথমেই প্রচলিত কিছু রীতি-নীতির কথা আসি। যেমন: এই সাত দিন কোন শুভকাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া, আল্লাহর নামাজ থেকে শুরু করে পুজোয় অঞ্জলি দেওয়া, দেবদেবীর মূর্তি স্পর্শ সবেতেই বাঁধা।তারপর খাওয়া-দাওয়ায় বিভিন্ন বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে। যেমন: এইসময় টক জাতীয় খাবার, ঠান্ডা জল,শসা ইত্যাদি খেতে না দেওয়া। তারপর খোলা চুলে বাইরে ঘোরাফেরা করা যাবে না,গাছ স্পর্শ করা যাবে না, এই সাতদিনে ব্যবহৃত জামা-কাপড় রোদে শুকানো যাবে না ইত্যাদি বিভিন্ন প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

[এরপর অধ্যাপিকা একটু থামেন এবং তিনি চেয়ারে গিয়ে বসেন আর সেই সময় মঞ্চে উপস্থিত সকলকে কলেজের পক্ষ থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। বিতরণ হয়ে গেলে অধ্যাপিকা পুনরায় মাইক হাতে মঞ্চের সামনে উপস্থিত হন এবং পুনরায় তার বক্তব্য পেশ করেন]

অধ্যাপিকা : এখানে উপস্থিত সকলকে বলছি আপনারা সবাই একটু ভেবে দেখুন মেয়েদের জীবনে ওই সাতটা দিন ছিল বলেই আজ আমরা প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে আসতে পেরেছি, আর সেই সাতটা দিনেই মেয়েরা অপবিত্র হয়ে যাবে! এটা কি সম্ভব? কিন্তু তাও আমরা মেয়েদের এই সাতটা দিন কোন শুভকাজে থাকতে দিই না। আসলে অনেক কাল আগে আমাদের জীবনধারা এমন ছিল না। তখন আমাদের প্রত্যেক দিন অনেক পরিশ্রমকর কাজ করতে হতো।যে-কোন কাজ আজকের মতো এতো সহজ ছিল না।তখন চিকিৎসাশাস্ত্র-ও এতো উন্নত ছিল না, তাই মেয়েদের বিশ্রামে রাখার জন্য তাদের কাজ কমিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু সেই চিন্তাধারা বদলাতে বদলাতে আজকের সমাজে এক ভ্রান্ত কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে, যেখানে ওই সাতদিনে মেয়েদের স্পর্শকে-ও নিচু চোখে দেখা হয়। এমনকি এই সময় যাতে জীবাণু সংক্রামক না হয় তাই জামা কাপড় রোদে শোকানো বিশেষ প্রয়োজন অথচ আমরা তো উল্টোটাই করে থাকি। চিকিৎসা শাস্ত্রে এই সময় পুষ্টিকর খাদ্য আহারের নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু আমরা খাবারের ক্ষেত্রেও নানা বিধি-নিষেধ নিয়ে আসি।

[অধ্যাপিকা একটু থামেন এবং টেবিলে রাখা জলের বোতল থেকে একটু জল খেয়ে নিয়ে তারপর আবার বলেন]

এই যে আমি জল পান করলাম এই জল পানেও না জানি কত মেয়ের কত বাঁধা আছে। প্রত্যেক মেয়ের জীবনের এই সাতটা দিন আল্লাহ,ভগবানের-ই সৃষ্টি করা অথচ তাঁর নামাজে,পুজোয় আমরা তাঁর সৃষ্টিকেই অপরিস্কার,নোংরা বলি। এইসময় একজন বোনকে তার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা পর্যন্ত দিতে দেওয়া হয় না। ভাবুন তো আপনারা তাহলে তার মনে এই সাতদিন সম্পর্কে কেমন ধারণা জন্মাতে পারে! একজন মেয়ে প্রতিমাসে অনেক কষ্ট সহ্য করে নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টি করার জন্য অথচ আমরা সেই সৃষ্টি কর্তাকেই অশুভ, অপবিত্র বলে থাকি। এই সাতদিন মেয়েদের নানা শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় আর আমরা তাদের পাশে না থেকে বরং শারীরিক কষ্টের সঙ্গে মানসিক কষ্টটাও তাদের উপহার হিসেবে দিই। মেয়েদের প্রতি মাসের এই সাত দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা হওয়া কখনোই কোনো খারাপ বা অশুভ কিছু হতে পারে না বরং এটা না হওয়াই খারাপ, এটা না হলে মেয়েদের অনেক সময় অনেক গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। অথচ আমরা অনেক সময় তাদের এমন ঔষধ দিয়ে থাকি যাতে তাদের সেই মাসে এটা বন্ধ থাকে। আমরা জানি ছোটবেলায় বাচ্চারা লুকোচুরি খেলে কিন্তু একটা মেয়ে কৈশোরে পা দেওয়ার পর আমরা নতুন করে তাকে লুকোচুরি খেলা শেখাই সমাজের সাথে, পরিবারের সাথে একটা সাধারণ বিষয় যেটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টাকে নিয়েও প্রতি মুহূর্তে এত গোপনীয়তা কেন বলতে পারেন? এমন গোপন করতে করতে মেয়েদের মনে এমন ধারণা জন্মানোই স্বাভাবিক যে এটা বোধহয় খুব খারাপ কিছু, এই সময়টা তারা হয়তো খারাপ হয়ে যায়, তাদের মধ্যে নানা ভয় আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ওই সাত দিনের কথা ভাবলে। অথচ যে সাত দিন না থাকলে আমরা একজনও থাকতাম না। এই লুকোচুরির প্রভাব থেকে কেবল মেয়েদের উপর পড়ে তাই নয়, ছেলেদের উপরেও এর প্রভাব পড়ে। ছেলেরা এই সাতদিনের বিষয় সঠিকভাবে অবগত হতে পারে না। তাদের মনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি হয়, অনেক ভুল ধারণার জন্ম নেয়। অনেক সময় দেখা যায় ছেলেরা এই বিষয় না বোঝার জন্য মেয়েদের এই সাতদিনের বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে অনেকরকমের খারাপ ব্যবহার করে থাকে, এখানে দোষটা সম্পূর্ণরূপে তাদের থাকে না আমাদের সমাজেরও দোষ থাকে।

মেয়েদের এই সাতদিনের বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে অনেকরকমের খারাপ ব্যবহার করে থাকে, এখানে দোষটা সম্পূর্ণরূপে তাদের থাকে না আমাদের সমাজেরও দোষ থাকে।তাই এই বিষয়টা আসলে কি তা নিয়ে সকলের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মেয়েদের প্রাচীনকাল থেকে নানা কুসংস্কার অবহেলা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই তুলনায় আজ মেয়েরা অনেকটা স্বাধীন হতে পেরেছে এবং সেটাও আমাদের সকলের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে কিন্তু এখনো বেশ কিছু বিধিনিষেধ কুসংস্কার তাদের নিয়ে প্রচলিত রয়েছে। আমরা কি পারিনা তাদের এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে? আমরা কি পারিনা মাসের ৭ টা দিন আর বছরের ৮৪ টা দিন তাদের জন্য আনন্দে ভরিয়ে দিতে? আমি এমন বলছি না যে এই সাতদিন মেয়েদের মাথায় তুলে নাচতে হবে, তবে এটাও বলছি না যে এই সাতদিন মেয়েদের পায়ের তলায় দমিয়ে রাখতে। আমি শুধু এটাই বলছি যে মেয়েদের জীবনের এই স্বাভাবিক সাতটা দিনকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য, তাদের জীবনের স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখার জন্য। আজ আপনারাই বলুন আমরা কি পারিনা মেয়েদের জীবনের এই স্বাভাবিক সাতটা দিনকে স্বাভাবিক করে তুলতে?

[সেখানে উপস্থিত সকলের চোখ জলে ভরে যায়, তারা বুঝতে পারে তাদের ভুলটা।বেঞ্চে বসে থাকা সকল অভিভাবক অভিভাবিকা-রা একসাথে বলে ওঠে পারি, পারি, আমরা নিশ্চয়ই পারি]

[অধ্যাপিকার চোখেও মৃদু জল। চোখ ছল ছল করে তার অথচ মুখে এক তৃপ্তি পূর্ণ হাসি নিয়ে সে বলে]

অধ্যাপিকা : চলুন তাহলে আমাদের দিয়েই শুরু হোক এই কুসংস্কার দূরীকরণের ছোট্ট পদক্ষেপ। আমার বিশ্বাস আমাদের দেখাদেখি বাকিরাও বদলাবে। আমাদের নিজেদের যেমন বদলাতে হবে তেমন অপরকেও বদলাতে হবে তবেই এই সমাজের সংস্করণ সম্ভব হবে। সকলের কাছে আজ আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ, মেয়েদের জীবনের এই সাতটা দিনকে কুসংস্করের কালো অন্ধকারে ঢেকে না দিয়ে রামধনুর সাতটা রঙের মতো রাঙিয়ে তুলুন। নমস্কার। আজ আমার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত করছি।

[অধ্যাপিকা রাখী ঘোষ সকলকে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে]

[অন্য দিক থেকে অধ্যাপিকার কথা সমাপ্ত হওয়া মাত্র বেঞ্চে বসে থাকা সকলের করতালির আওয়াজে মঞ্চ মেতে ওঠে]

[এরপর সকল অভিভাবক-অভিভাবিকারা তাদের সন্তানদের জড়িয়ে ধরে, তাদের সকলের চোখ ছলছল করছে, তাদের সকলের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন হতে থাকে]

রাজিয়ার আম্মা : (রাজিয়াকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে)কিরে রাজিয়া ভোরের নামাজ পড়া হয়নি তো কি হয়েছে, সন্ধ্যার নামাজ তো পড়তে হবে নাকি?

রাজিয়া : সত্যি আম্মা আমি আজ নামাজ পড়বো!

রাজিয়ার আম্মা : হ্যাঁ পড়বি তো নিশ্চয়ই পড়বি। আমি না বুঝে তোকে আজ অনেক বকেছি, মেরেছি।চল এবার বাড়ি চল।

বর্ণালীর মা : বর্ণালীরে ভাইফোঁটার বাজার তো সব করাই আছে, এবার চল ভাইকে ফোঁটা দিতে হবে তো, ভাইকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি?

বর্ণালী :কি বলছো মা! এই বছর ভাইফোঁটা হবে তাহলে?

বর্ণালীর মা : কেন হবে না? একশো বার হবে হাজার বার হবে।

বর্ণালী :তুমি কত ভালো মা।চলো মা তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই, ভাই বসে আছ।

[এরপর ধীরে ধীরে মঞ্চে উপস্থিত সকলে মঞ্চ থেকে একে একে নেমে আসে, আস্তে আস্তে মঞ্চ ফাঁকা হয়ে যায়]

[সাধারণত আমরা দেখি নাটক শেষে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। এক্ষেত্রে মঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাবার পর মঞ্চের চারিদিকে রামধনুর সাতটি রঙের আলো জ্বলে ওঠে, মঞ্চ অন্ধকার হওয়ার পরিবর্তে রামধনুর সাত রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। এই রামধনুর সাতটি রং যেন মেয়েদের প্রতি মাসের ওই সাতটি দিনের প্রতীক]

[ধীরে ধীরে মঞ্চে পর্দা নেমে আসে]

সমাপ্ত

জীবন তৃষ্ণা

শুভেচ্ছা মন্ডল

চরিত্র সমূহ -
শ্রাবণী - একটি মধ্যবয়সী গৃহবধূ , বয়স আন্দাজ ৩৩-৩৫
অজয় - একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, শ্রাবণীর স্বামী
শ্রাবণী র শাশুড়ি - একজন বৃদ্ধা মহিলা
সোনালী - শ্রাবণী র কিশোর মেয়ে
কিশোরী শ্রাবণী
শ্রীতমা - ১০ বছর বয়সী শ্রাবণীর বোন
মা - শ্রীতমা, শ্রাবণী র মা, একজন ৪০-৪৫ বছর বয়সী ভদ্রমহিলা
পুরুষ - একজন ৩৫ বছর বয়সী, সম্পর্কে শ্রাবণী, শ্রীতমা র কাকু

প্রথম দৃশ্য

(মাঝরাতে দৃশ্য)

(পর্দা উঠলে দেখা যাবে একটা ছোট্ট সাজানো ছিমছাম ফ্ল্যাট এর ডাইনিং রুমে র দৃশ্য, ঘরের একদিকে সোফায় বসে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, সামনে একটি ছোট টি টেবিল, একটি ছোট নোটবুক হাতে করে,কিছু একটা হিসেবে করছে। একদিকে তার স্ত্রী একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে, চোখ এ তার ক্রোধ,চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে অন্য একটি চেয়ারে বসে নির্বিকার উদাসীন অবস্থায় বসে একজন বৃদ্বা)

(নোটবুক টা বন্ধ করে অজয় বললো)

অজয় : শ্রাবণী শ্রাবণী চুপ করো, আস্তে কথা বলো, কেন লোক জানাজানি করছো ! যতো বেশি লোক জানবে ততো আমার মান সম্মান নষ্ট হবে, এসব কোরো না

শ্রাবণী : কি বলছো , অজয় তোমার কোনো ধারনা আছে, কি ঘটে গেছে আমাদের মেয়ের সাথে !!! জানি আমি , জন্মানোর প্রথম দিন থেকেই ও তোমার পরিবার,তোমার সবার চক্ষুশূল, কিন্তু ওকে আমি গর্ভে ধরেছি, ওর অপমান আমি সইবো কেমন করে ?

শ্রাবণী র শাশুড়ি : বৌমা একটু আস্তে, লোক জানাজানি না করে তুমি খান্ত হবেনা দেখছি। তা দরকার কি ছিল শুনি, মেয়েকে ওসব বিদেশি জামাকাপড় পড়িয়ে কলেজের অনুষ্ঠানে পাঠানোর। মেয়েমানুষ, ঘরে বসে থাকুক, কি আছে অতো বাইরে বেরিয়ে ধিঙ্গিপনা করার ।

অজয় : একদম ই তাই। শ্রাবণী শোনো, কিছুদিন এর জন্য তুমি আর তোমার মেয়ে তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও

শ্রাবণী : তার মানে বোঝা গেল, তোমরা কোন প্রতিবাদ করবে না ?লড়াইটা শুধু আমার ??

শ্রাবণী র শাশুড়ি : অতো বুঝিনা বাপু, তোমার মেয়ে তুমি বুঝে নাও, কিন্তু মনে রেখো, আমার খোকার যেন সম্মান নষ্ট না হয়।

শ্রাবণী : মা কি বলছেন আপনি !! দুটো অভদ্র পাড়ার নোংরা মস্তান, সোনালী র সাথে অসভ্যতামি করবে , নোংরামি করবে , এটা কি করে মেনে নেবো ?

শ্রাবণী র শাশুড়ি : তা আর কি কিছু করার আছে !! এতো রাতে, পাড়ার ওই গলি দিয়ে আসার কি ছিল শুনি !!

শ্রাবণী : মা please, এতে ওর কি দোষ ছিল ?

(অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো)

অজয় : শোন শ্রাবণী, যা পারো করো , কিন্তু তোমাদের মা মেয়ে র জন্য যদি সোসাইটি তে আমার নাম নষ্ট হয় ,আমি কিন্তু তার সহ্য করবো না।

(ফোনটা নিয়ে অজয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে)

শ্রাবণী র শাশুড়ি: শোন বৌমা, মেয়ে তখন তুমি জন্ম দিয়েছো, দায়িত্ব তোমার, আমাদের ওপর দায় চাপাবে না।

শ্রাবণী : মা !!!!!!!

শ্রাবণী র শাশুড়ি : আমি কিছু ঝামেলা চাই না, এই আমি বলে দিলুম ।

শ্রাবণী : তবে আমি ও বলে রাখছি মা, আমার মেয়ে র জন্য আমি একা লড়বো, কাউকে চাই না। কাউকে না

শ্রাবণী র শাশুড়ি: যা পারো করো, শুধু আমাদের একটু শান্তি দাও। যেদিন থেকে এই বাড়িতে বউ হয়ে এসেছো, সেদিন থেকে একের পর এক অশান্তি, ঝামেলা। আর পারিনা বাপু

শ্রাবণী: আপনারা আমাকে শান্তি দেননি। বিয়ের আগে আপনার ছেলে,কতোই না স্বপ্ন দেখিয়েছিল, (শ্রাবণী র গলার স্বর কাঁপছে, নেমে এলো গলার স্বর,) , শ্রাবণী তোমার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন, তোমার নাচ দেখে ই তো আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, তুমি এগিয়ে চলো, আমি আছি পাশে। আর ,আর , তারপর যেই এ বাড়িতে পা দিলাম সবকিছু কেমন বদলে গেল, হঠাৎ করে সেই চেনা অজয় কতোটা বদলে গেল, বন্ধ হয়ে গেল আমার নাচ, ঘুঙুর দুটিকে ছুঁয়ে ফেলে দিলেন আপনি । আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিলেন। এক বছরে র মাথায় সোনালী হলো, কেন মেয়ে হলো !!! আপনি তো চেয়েছিলেন নাতি। সোনালী হয়ে গেল চক্ষুশূল আপনাদের।

শ্রাবণী র শাশুড়ি : শোন বৌমা, এসব পুরোনো কথা ঘেঁটে কাজ নেই। এমনি এমনি কি আটকেছি!!! বাড়ির বৌ নাকি নাচ করবে !! ছি! ছি ! শোন তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও, আর জ্বালিও না। ক্ষান্ত দাও

(শ্রাবণী র শাশুড়িও বেড়িয়ে গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একটি ছিমছাম ঘর এর দৃশ্য।পড়ার টেবিল, কয়েকটি বই, একটি কিশোরী মেয়ে টেবিলে মাথা দিয়ে বসে আছে, বিদ্ধস্থ লাগছে তাকে)

(শ্রাবণী র প্রবেশ, ঘরে ঢুকে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে লাগল। মেয়েটি, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো)

শ্রাবণী : কাঁদিস না মা , তুই তো কোন দোষ করিস নি। এই পৃথিবী ই হলো দোষী, এই পৃথিবী তে নারী জাতির স্থান অতি নগন্য রে। এই জাতি সকলের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জায়গা।

সোনালী : মা , মা জানো তো , ওরা আমাকে জোর করে চেপে ধরে নিয়ে গেল, আমার হাত পা চেপে ধরেছিল, আমি প্রানপন তোমাকে ডাকছিলাম, যে মা আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে খেয়ে ফেলছে, মা কি হবে মা, কি করবো আমি এবার!!! (সোনালী কাঁদতে কাঁদতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো)

শ্রাবণী : চল মা, আমরা থানায় যাবো, বলবো ওদের সব বলবো, যা আমি পনেরো বছর আগে করতে পারিনি, আজ তার করবো, করব ই। কাউকে ছাড়বো না, কাউকে না, সবাই দোষী সবাই, ওই লম্পটগুলো, তোর বাবা সবাই সবাই, কাউকে ছাড়বো না। চল মা চল

সোনালী: মা, আমি যাবো না মা, যেতে পারবো না, সবাই জেনে গেলে !!! কি হবে মা !!!! আমি পারবো না মা

শ্রাবণী: পারতে হবে তোকে, পারতেই হবে, তোকে যারা নষ্ট করেছে, তাদের জীবন টা নষ্ট হোক, তুই তা চাস না ?

সোনালী: চাই তো চাই কিন্তু মা .....

শ্রাবণী: তুই তৈরী হ। আমরা বেরোবো।

(শ্রাবণী র প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(শ্রাবণী র কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে সোনালী, সোনালী র মাথায় হাত বোলাচ্ছে শ্রাবণী)

শ্রাবণী (নিজের মনে ক্ষীন স্বরে বলে চলেছে): অপরাধ এর পরিবর্তন ঘটেনা, অপরাধী র পরিবর্তন ঘটে না, বিচার এর পরিবর্তন ঘটেনা, পরিবর্তন ঘটে শুধু সময় এর। হ্যা হ্যা এখন বুঝতে পারছি, পনেরো বছর আগে , ওই দিন, ও কোন লাভ হতো না বুঝতে পারছি এখন , সবাই উপরতলার কেনা চাকর ! সবাই।

সোনালী (চোখ খুলে মা এর মুখের দিকে তাকিয়ে) : মা আমি ঠিক আছি এখন , আমি ভেঙে পড়িনি, ঠিক আছি, তুমি চিন্তা করো না মা।

শ্রাবণী: না রে মা, তুই জানিস না, আমি কি সহ্য করেছি, কি সহ্য করছি। জানিস তো, তোর ছোট মাসী, সে ও তোর মতো ছিল, বেপরোয়া কিন্তু বড্ড মিষ্টি, তাকে ও সয়তান ছিঁড়ে খেয়েছিল।

সোনালী: কি বলছো ! মা

(সোনালী উঠে বসলো)

সোনালী: মাসি ভেঙে পড়েনি ? মাসি আমার মতো কাঁদেনি ??? মাসি হেরে যায়নি ????

শ্রাবণী: একটা দশ বছরের শিশু!!!! কি ছিল তার বলতো !!! কি আনন্দ পেয়েছিল শয়তান টা !!!!!

চতুর্থ দৃশ্য

(পনেরো বছর পূর্বে)
(একটি ছিমছাম ঘর, ঘরে কিছু ছোটো ছোটো আসবাব র, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা একটি চেয়ারে বসে)
(একটি মধ্যবয়সী পুরুষ এর প্রবেশ)
পুরুষ: বৌদি শ্রীতমা কে আজ নিয়ে যাবো আমার বাড়ি
(পিঠে ব্যাগ নিয়ে কিশোরী শ্রাবণী র প্রবেশ)
কিশোরী শ্রাবণী : কাকু !!! কখন এলে ???
পুরুষ : এই যে কিছুক্ষণ আগে ই। এই তোর বোনকে নিতে এলাম, তোদের কাকী নিয়ে মেতে বললো
কিশোরী শ্রাবণী : তাই !!! শুধু বোন !!! আমি বড়ো হয়ে গেছি , বলে আমাকে এখন আর কেউ কোথাও নিয়ে যায়না।(মজার ছলে)
পুরুষ (হেসে উঠলো) : না না একদম ই তা না। তোর তো এখন অনেক পড়াশুনা আছে কিন্তু ও তো ছোট
(শ্রীতমা কাঁধে একটা ছোট্টো ব্যাগ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল, হাসতে হাসতে)
শ্রীতমা : আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনে , তৈরি ও হয়ে গেছি। চলো কাকু , আজ খুব মজা করবো।
শ্রাবণীর মা : আচ্ছা , সাবধানে যাস, দুষ্টুমি করিস না কিন্তু।
(পুরুষটি ও শ্রীতমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

(অন্ধকার ব্যাকগ্রাউন্ড, শ্রীতমার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ স্বরে)
"কাকু , আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার সাথে শোবো না , কাকি কোথায় আমাকে কাকির কাছে ..... "
(পুরুষ মুখ চেপে ধরলো শ্রীতমা র)
পুরুষ : একদম চুপ করে থাক, এসব যদি মা কে বলিস আমি তোদের বাড়ি আর কোনোদিন যাবোনা।
শ্রীতমা (ভয়ার্ত স্বরে আর্তনাদ): কাকু আমি বাড়ি যাবো , আমাকে বাড়ি দিয়ে এসো , মা র কাছে যাবো। কাকু ছেড়ে দাও আমাকে কাকু ছেড়ে দাও।
পুরুষ : চুপ একদম চুপ, কথা বলবি তো মেরে দেবো
শ্রীতমা : কাকু!!!!! তুমি এগুলো কি করে বলছো !!! তোমাকে আমরা কতোটা ভালোবাসি, বাবা কতোটা ভালোবাসে , কাকু আমি বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(ঘরে পুরুষ ও শ্রীতমা র প্রবেশ, শ্রীতমা র শরীর বিদ্বস্ত, চোখ মুখ এ ভয় এর ছাপ স্পশ্ট)
মা : কি রে তোরা ফিরে এলি, তোর না আজ থাকার কথা ছিল
পুরুষ : বৌদি , ও থাকতে চাইলো না
শ্রীতমা : মা আমি শোবো
(পুরুষ টি এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসলো)
(শ্রাবণী ঘরে প্রবেশ করল)
কিশোরী শ্রাবণী : কি রে শ্রী , ফিরে এলি ?? দুষ্টুমি করছিলি নিশ্চই, তাই কাকু দিয়ে গেল
(মা তাকিয়ে ছিল শ্রীময়ী র দিকে)
মা হঠাৎ শ্রীময়ী কে জিজ্ঞেস করলেন : এই শ্রী , কি হয়েছে তোর ? ঘুম পাচ্ছে ?
আয় আমার সাথে আয় ।
(মা শ্রীময়ী বেরিয়ে গেল, ঘরে পুরুষটি ও শ্রাবণী। পুরুষটি ফোন ঘাটছিল নিজের মতো, আর শ্রাবণী দাঁড়িয়ে ঘরটাকে পরিস্কার করছিল হালকা)
(কিছুক্ষণ পর মা এর প্রবেশ, মা সোজা গিয়ে পুরুষটির কলার ধরে টেনে মাটিতে ফেলে দিল)
মা : এই শয়তান!!!! বল বল !!! কেন করলি আমার মেয়ে র সাথে এমন কেন করলি।
(মারতে মারতে)
পুরুষ (আমতা আমতা করতে করতে) : আমি কিছু করিনি বৌদি, আমি কিছু করিনি
মা : কিছু করিস নি !!!! ওর ঘাড়ে ওগুলো কিসের দাগ !!! আমাকে শেখাতে এসেছিস । লজ্জা করে না, ওরে ও তোর সন্তান সম , কেন করলি এটা আমার মেয়ে র সাথে কেন করলি জানোয়ার !! ওই টুকু একটা শিশু কি বোঝে ও, কি বোঝে !!!! ও কি বোঝে !!!! কি আনন্দ পেলি , ওই টুকু শিশুর থেকে ??
পুরুষ : আমি কিছু করিনি আমি কিছু করিনি, ছেড়ে দাও আমাকে, নাহলে আমি নিজেই নিজেকে শেষ করে দেবো
মা : মরে যা তুই !!! কি রে তোর একবার এর জন্য ও মনে পড়েনি নিজের মেয়ের কথাটা !!! তোর মেয়ে ও তো তোর কাছে সুরক্ষিত নয়, তোর কোলে, কাঁধে চেপে বড়ো হয়েছে আমার বাচ্চাগুলো, কি করে করতে পারলি , কি করে !!! তুই তো নিজেও বাবা (মা কেঁদে ফেললো)

(হাত আলগা হয়ে গেলে পুরুষ টি পালিয়ে গেল)
(শ্রীতমা র প্রবেশ)
(ঘরের এককোণে শ্রাবণী দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে)
(শ্রাবণী দৌড়ে গিয়ে , বোনকে জড়িয়ে ধরলো)

মা (শ্রীতমা র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে): কিচ্ছু হয়নি মা , তোমার কিচ্ছু হয়নি। ঠিক আছে, এসব আর ভাববে না
কিশোরী শ্রাবণী (মাটিতে বসে পড়লো) : মা , কাকু এমন কেন করলো মা !!
মা: জানি না, সত্যি ই জানি না। (শ্রীতমা র দিকে তাকিয়ে), শ্রী, খুলে বলতো কি কি করেছিল শয়তানটা তোর সাথে ?

শ্রীতমা (কেঁদে উঠলো) : মা আমি শুতে চাইনি কাকুর সাথে , জোর করে শুলো , তারপর আমার জামাটা টেনে খুলে দিল, আমি বারন করেছিলাম, কিন্তু শোনে নি, তারপর , তারপর আমার গায়ের ওপর উঠে কিসব করছিল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা (শ্রীতমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো)

(মা ওকে বুকে চেপে ধরলো)

মা : তুই কাকিকে ডাকিসনি কেন চিৎকার করে ?

শ্রীতমা: কাকু বলেছিল, যদি চিৎকার করি, মেরে ফেলবে আমাকে

(শ্রাবণী উঠে দাঁড়ালো)

কিশোরী শ্রাবণী : মা চলো , ওই শয়তানসটার নামে পুলিশ কেস করবো, মা ওকে ছেড়ে দিওনা মা, মা ওকে ছেড়ে দিওনা,

মা : চুপ কর, আমার মেয়েটার সর্বনাশ হয়েছে জানি, কিন্তু, এখন যদি কেস করি , পুলিশ যদি ব্যাপারটার , আরো জানাজানি হয় , সবাই শ্রীতমা কে জিজ্ঞেস করবে , পুলিশ ওকে জিজ্ঞাস করবে, তাতে ও ভেবে ই চলবে ওর সাথে কতোই না খারাপ হয়েছে, ও ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাবে। ও যাতে ঘটনাটা ভুলে যায় ।ওর যেন কিছু মনে না থাকে , না হলে এ ঘটনা সবসময় ওকে কুড়ে কুড়ে খাবে।

কিশোরী শ্রাবণী (চোখে মুখে হতাশার ছাপ) : মা, ছেড়ে দেবো আমরা ওকে ?? কিচ্ছুটি বলবো না, এর কোন প্রতিবাদ হবে না?? কেন মা , কেন ?

মা : কিছু ই করার নেই যে মা আমাদের ! এই পশুগুলো কাউকে ছাড়ে না, কাউকে না, কেউ নিস্তার পায় না। ওরা নারীখাদক। শিশু থেকে বৃদ্ধ, কাউকে ওরা ছাড়ে না, কাউকে না, কাউকে না

(বলতে বলতে মা শ্রীতমা কে নিয়ে চলে গেল)

(মাটিতে পরে রইল শ্রাবণী)

(চারিদিক অন্ধকার, শ্রাবণী র ওপর হালকা আলো, তাতে ই শ্রাবণী বলে চলছিল)

কিশোরী শ্রাবণী : (নিজের মৃত বাবার ছবি হাতে চেপে ধরে) , বাবা !! বাবা !!! সব পুরুষ কেন হয় না, তোমার মতো ?? কেন বাবা !!! তুমি তো আমাকে মা বলে ডাকতে, আমরা মেয়েরা যদি মা এর জাত ই হই , তবে কেন , মা এর ওপর এ অত্যাচার, কেন !!সবাই তোমার মতো করে কেন ভালোবাসেনা !!! সবাই কেন তোমার মতো হয় না।

(শ্রাবণী উঠে দাঁড়ালো)

কিশোরী শ্রাবণী (বলে চললো) : বাবা যাকে তুমি ভরসা করেছিলে, ভাই এর জায়গায় বসিয়েছিলেন, তার এই বিশ্বাসঘাতকতা, তুমি সহ্য করতে পারতেন না গো, পারতে না। মানুষ বড়ওই নিষ্ঠুর। যেখানে কোন প্রতিবাদ নেই, কোন বিচার নেই,সবাই শুধু নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য মৃত , বাবা , কেন চলে গেলে তুমি বাবা !! কেন !!

সপ্তম দৃশ্য

(বর্তমান সময়)
(দৃশ্যে দেখা যাবে , শ্রাবণী বসে আছে , তার সামনে কিছু খাবার সহ থালা , বাটি রাখা)
(বাপের বাড়ি তে শ্রাবণী ও তার মেয়ে, শ্রাবণী বসে খাবার গোছাচ্ছে, পিছন থেকে সোনালী এসে জড়িয়ে ধরলো মা কে)
সোনালী : মা !!!
শ্রাবণী : উফফ কি যে করিস , কাজ করছি তো
(সোনালী মা এর গলা ছেড়ে একগাল হাসলো)
সোনালী: তুমি জানো মা,আজ কোথায় গেছিলাম?
শ্রাবণী : কোথায় রে ?
সোনালী : ছোটো মাসির কাছে, আমরা দুজন এ মিলে তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছি, চোখ বন্ধ করো আগে
শ্রাবণী : কি এনেছিস ? আর শ্রী ই বা কোথায়?

(সোনালী মা এর চোখ বন্ধ করাতে করাতে উত্তর দিল)
সোনালী : মাসি রাতে আসবে তার আগে হাত পাতো তো
(শ্রাবণী হাত পাতলো)
শ্রাবণী: কি যে করিস তোরা !! কি দিবি দে দেখি
(সোনালী একটা লাল রঙের পুঁটুলি হাতে দিল মা এর, শ্রাবণী ওটা খুলে বের করলো দুটো ঘুঙুর, শ্রাবণী র চোখ থেকে জল পড়ছে)
সোনালী: মা , তুমি আবার নাচ শুরু করো, আমি তোমার সাথে আছি
শ্রাবণী : না রে মা , এটা হয়না , হয়না এটা
সোনালী (মা এর মুখ টা তুলে ধরল) : মা ? আমাকে নাচ শেখাবে? তালিম দেবে আমায় ? তুমি আমি একসাথে নাচবো,স্বাধীন ভাবে, মন খুলে বাঁচবো এবার, একসাথে ।
(শ্রাবণী নিজের মেয়ে কে জড়িয়ে ধরলো)
(মঞ্চে ক্ষীণ আলো)

বহুরূপী

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

চরিত্র

জয়া-: একটি বছর ১৮-১৯ এর কলেজ পড়ুয়া, তবে সে ছেলে সেজে থাকবে প্রথম তিনটে দৃশ্যে।

দীপক-: একটি বছর ২১-২২ এর ছেলে, তবে সে প্রথম তিনটি দৃশ্যে মেয়ে সেজে থাকে।

বাবা-: একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক

মালতি মাসী : কাজের লোক

কনে-: ২৩-২৪ বছরের এক যুবতী

কনের মা-: এক মাঝবয়েসী মহিলা

এ ছাড়াও ছেলে ১, ছেলে ২, ছেলে ৩ (সকলেই অল্প বয়েসী যুবক)

প্রথম দৃশ্য

(একটা ঘরে চেয়ারের উপর কনে বসে আছে। সামনে টেবিলের উপর সাজার জিনিস পত্র রাখা। কনে কে সাজাচ্ছে দীপক, মেয়ের ছদ্মবেশ নিয়ে। পাশে কনের মা দাড়িয়ে কিছু জিনিস গোছাচ্ছে)

কনে: দিদি বেশি heavy makeup করো না কিন্তু। আমার আবার natural makeup ই বেশি পছন্দ

কনের মা (পাশ থেকে মুখ ভেংচিয়ে): এই তুই থাম তো! (দীপালীর দিকে তাকিয়ে)-: তুমি ওকে বেশি করে ওইসব ফর্সা করার রং চং আছে না? ওইসব মাখিয়ে দাও। দেখতেই তো পাচ্ছো গায়ের রং চাপা।

কনে (কাতর কণ্ঠে)-: কিন্তু মা মিথ্যে সেজে কি লাভ? ওরা কি আমায় বিয়ের পরে দেখবেনা? নাকি শুধু আমার গায়ের রং দিয়েই সংসার চলবে?

কনের মা (বিরক্ত হয়ে)-: উফফ! আগে বিয়েটা হক তারপর তুই নিজেই জিজ্ঞাস করে নিশ এই সব প্রশ্ন! বিয়েটা হতে দে।

কনে: কিন্তু...

কনের মা: আমার এখন ফাউ বকার সময় নেই, অনেক কাজ আছে। (দিপালী কে) তোমায় যে রকম বললাম ওরকম ভাবেই সাজাবে কিন্তু।

(প্রস্থান)

দীপক: কি গো? মন খারাপ করছো?

কনে (নিচু স্বরে): কই না তো! এ আবার নতুন কি? সেই ছোটো বেলা থেকেই তো শুনে আসছি! আমি কালো.. আমার বিয়ে হবেনা! এখন যে হচ্ছে এই ঢের! তবে আর কি? দাও কারি কারি মেকআপ থুপে!

দীপক (কতক হেসে)-: চিন্তা করোনা। আজ তোমার বিয়ে.. তোমাকে তোমার ইচ্ছা মতোই সাজাবো। এই দিন তো আর বার বার আসেনা!
কনে: ফিলমস্টার হলে আলাদা ব্যাপার ছিল! (উভয়ই হাসলো)
কনে: Thank you আমায় বোঝার জন্যে! আসলে আমার মাও তো এই সমাজেরই একটি সদস্য! চিন্তা ভাবনা আলাদা হবেই বা কি করে?
দীপক: সে তোমার মা তোমার ভালই চায়। আজ তার উপর রাগ করোনা!
কনে-: রাগ করবনাই বা কেনো? আমার চোখে এইসব খুব বাঁধে। জানো, আমার দিদির একটা বান্ধবী আছে..ওর দাদা নাকি খুব ভালো সাজায়। আমার মাকে দিদিটা এসে বলেছিল" কাকিমা, দাদা যদিওকে একবার সাজায় তাহলে কেউ আরে মুখ ঘোরাতে পারবেনা!" মার তো "দাদা" কথাটা শুনেই-চক্ষু চড়ক গাছ!
দীপক: (সাজাতে সাজাতে) তারপর?
কনে: তারপর আর কি! মা বলে কি বেটা ছেলেরা আবার সাজাই নাকি? সখ করে মেয়ের খেলাচ্ছ তারপর দেখবো সং সাজিয়া চলে যাবে। তারপরেই তো তোমার কথা বললো জয়া দি.. চেনোই তো!
দীপক: হ্যা! আমারই তো নিজের বো... বৌদির বোন। আচ্ছা সে সব ছাড়ো। তোমার সাজ শেষ.. ভালো লাগলো?
কনে (আয়না দেখে): ওমা!!! আমায় এত সুন্দর লাগছে? আমি তো ভাবতেই পারছিনা! এই শোনো.. খেয়ে যেও কিন্তু!
দীপক: এই তোমার যে সাজটা ভালো লাগলো এইটাই অনেক! আমার একটু কাজ আছে গো বেরোত হবে! Congratulations for your marriage!
(Background sound: কনে কে নিয়ে আয়)
দীপক : ওই তোমার ডাক পড়লো! চলো!

(উভয়ই প্রস্থান। Lights off)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ছেলে ১, ছেলে ২, ছেলে ৩, একসাথে মিউজিক সিস্টেম সেট করছে। ছেলে ১ এর হাতে মাইক। ২য় ছেলের হাতে গিটার। ছেলে ৩ দাঁড়িয়ে সামনে কিবোর্ড (কাল্পনিক)। ইতিমধ্যেই জয়ার প্রবেশ, ছেলের ছদ্মবেশ নিয়ে। পিঠে একটা ইলেকট্রিক গিটার)

ছেলে ১ (রেগে কিরে? কটা বাজে? না এলেই পারতিস!
জয়া (ক্ষিপ্ত হয়ে)-: তোদের আর কি! আলালের দুলাল সব! আমার জ্বালা আর কি বুঝবি?
ছেলে ২ (ব্যঙ্গ করে): কি হলো আজকে আবার তোর বাবা কি করলো?
জয়া (ব্যাগ থেকে গিটার টা বার করতে করতে): আজকে বাবার আসার কথা ছিল ফ্ল্যাটে। তাই ভাবছিলাম আসবনা! Last moment এ cancel করে দিলো কাজ পরে গেছে তাই।

ছেলে ১, ছেলে ২, ছেলে ৩ (একসাথে হেসে উঠে) তুই আর তোর বাবার ভয়!

জয়া: ধুর শালা! চুপ কর তো!তোদের আর কাজ নেই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করা ছাড়া?

ছেলে ৩ (খানিক তেলিয়ে): আরে রাগিস না! আমরা তো একটু মজা করলাম।

ছেলে ১ (কটাক্ষ করে): আমি এইটাই বুঝিনা তোর বাবার এত সমস্যা কিসে? Young ছেলে.. এখন ই তো সময়! খাবি দাবি.. আড্ডা দিবি.. গান বাজনা করবি.. chill করবি.. এইটাই তো জীবন। তোর মতন ভীতু হলে কি আর হয়!

জয়া (রেগে গিয়ে উচ্চকন্ঠে): তোরা কর গিয়ে মজা। আমি practice করতে এসছি..করলে কর.. নাহলে আমি চললাম। আমি কাউর তামাশার খোরাক না।

(জয়া কয়েক পা এগিয়ে, বেরিয়ে যেতে লাগলো)

ছেলে ৩ (হাত ধরে টেনে): আরে দাড়া দাড়া! কোথায় যাচ্ছিস? সব কথাই এত রাগলে চলে ভায়া?

জয়া (থেমে দাড়িয়ে): রাগবো না তো কি করবো?

ছেলে ২ (কটাক্ষ করে): আরে যেতে দে ওকে। ও গিয়ে ওর বাবার জপ করুক!

জয়া (রাগে মুখ লাল হয়ে): ভাই লিমিট থাকে একটা! খিস্তি খেতে না চাইলে চুপ কর বলে দিচ্ছি।

ছেলে ৩-: আরে তোরা কি শুরু করেছিস বল তো? থামবি? এমনি ই বাড়ির চিৎকার চেঁচামেচি..এইখানে এসেও তাই!

জয়া (চিন্তিত ভাবে): কেনো? তোর আবার কি হলো?

ছেলে ৩-: আরে বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে চাকরি করার জন্যে। বোনের বিয়েও আমায় ই দিতে হবে।

ছেলে ১ (অবাক হয়ে): কি বলিস? ও তো সবে স্কুল পাস করলো। এখন ই?

ছেলে ৩ (হতাশ হয়ে): আমাদের বাড়ির ঐ নিয়ম। ১৮ বয়েসের মধ্যে বিয়ে না দিলে নাকি উৎসন্নে যায়।

ছেলে ১ (অবাক হয়ে) : কি বলিস? ও তো সবে স্কুল পাস করলো। এখন ই?

ছেলে ৩ (হতাশ হয়ে): আমাদের বাড়ির ঐ নিয়ম। ১৮ বয়েসের মধ্যে বিয়ে না দিলে নাকি মেয়ে উৎসরে যায়।

জয়া (ব্যাকুল হয়ে): কিন্তু ও তো জানতাম ভালো স্টুডেন্টই ছিল। কিছু একটা কাজ বাজ করলে তো নিজের পায়েই দাঁড়াতে পারতো।

ছেলে ৩ (মাথা নাড়িয়ে): তা ঠিক! কিন্তু নিজের জন্যে আর স্ট্যান্ড নিলো কোথায়? নিজের জন্যে তো নিজেকেই কথা বলতে হয়

ছেলে ১ (সংবেদনশীল হয়ে): এখন কার দিনেও নাকি এইসব হয়!

ছেলে ৩ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) ছাড়! (জয়ার দিকে তাকিয়ে) তাই বলছি নিজের জন্যে স্ট্যান্ড নে।

ছেলে ২: ও যা "বাবা! বাবা!" করে.. কোনদিন ভোলে বাবা ই দর্শন দিয়ে দেবেন। (সবাই একসাথে হেসে উঠলো। জয়া ভ্রু কুচকে মুখ ঘুরিয়ে নিল)
ছেলে ১: আরে ওর যা চিকন চিকন গাল.. পাতলা গলার আওয়াজ আর মেয়েলি আদল, ওর বাবা হয়তো ওকে মেয়েই ভাবে। তাই এত restrictions দেয়ে। (উচ্চস্বরে হেসে)
ছেলে ২-: ধুর! মেয়ে হলে ওকে আমরা আমাদের ব্যান্ডে নিতাম নাকি? এইসব ইলেকট্রিক গিটার ফিটার মেয়েদের বাজানোর জিনিস?
জয়া (ব্যঙ্গ করে হেসে): এই তো একটু আগে তোরা women empowerment এর কথা বলছিলি? কই গেলো সব?
ছেলে ১: আরে তা অসম্মান ও বা করলাম কই! করুক না কত কাজ ই তো আছে। তবে ইলেকট্রিক গিটার বাজাতে যে জোশ যায়.. যেই এনার্জি চাই.. সেইটা কি একটা মেয়ের থাকে?
ছেলে ৩-: ভাই সেই মনে আছে? একটা মেয়ে এসছিল অনেক আগে যখন আমরা গিটারিস্ট খুঁজছিলাম? ওকে তো মেয়ে বলেই আমরা বারণ করে দিলাম!
জয়া (চোখ ঘুরিয়ে নিম্ন স্বরে): bloody hypocrites!
ছেলে ১ (জয়ার দিকে তাকিয়ে) কিছু বললি?
জয়া : না কিছুনা! এইটাই যে তোরা..
ছেলে ২ (বিরক্ত হয়ে চিল্লিয়ে): আরে ধুর! রাখ তো তোদের ঘ্যান ঘ্যান! যার জন্যে আসা সেই কাজ টা করবি? গান টা ধর।

(Background এ গান বেজে উঠলো আইগীরি নন্দিনী। তাতে ছেলে ১ lipsync করলো। জয়া ইলেকট্রিক গিটার বাজালো। ছেলে ২ গিটার বাজালো আর ছেলে ৩ কীবোর্ড বাজালো (কাল্পনিক)।)
Lights off

তৃতীয় দৃশ্য

(মঞ্চের ডান দিকে ফ্ল্যাটের ঘর কল্পনা করা হলো। সেইখানে সোফায় বসে আছে দীপক ও জয়ার বাবা। পাশেই ঝাট দিচ্ছে মালতি মাসী। মঞ্চের মাঝ খানে ঘরের দরজা কল্পনা করা হলো। মঞ্চের বা দিকে দীপক ও জয়া, তাদের ছদ্মবেশে দাড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। উভয়ই দ্বিধা মগ্ন যে দরজা খুলবে কিনা)

দীপক (হাঁপাতে হাঁপাতে): তুই আমায় আগে বলবি না যে বাবা আসছে?
জয়া (জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে) তোকে তো কতবার ফোন করলাম তুল্লি না তো!
দীপক (মুখ বেজার করে): বিয়ে বাড়ির আওয়াজে শুনতে পায়নি। যখন দেখলাম তখনই তো কল ব্যাক করলাম।

জয়া: আর তা ছাড়া বাবার তো আজকে আসার কথা ছিলনা। বললো তো কাজ পড়ে গেছে তাই আসবেনা! আবার কি মনে হলো আমায় ফোন করে বললো যে আসছে

দীপক : তাই তো তরী কি মরি করে ছুটে আসলাম।

জয়া: আমিও তো তাই! রিহার্সাল ছেড়ে দৌড়ে দৌড়ে আসলাম।

দীপক : এই এতখুনে তো মালতি মাসী কাজ করতে চলে এসে বল? তার মানে বাবা কি ভেতরে? এসেছে নকি

জয়া (কাঁদো কাঁদো স্বরে): এই এরম বলিসনা। আমার খুব ভয় করছে। কি হবে?

দীপক : আমার কি আর করছেনা ভয়? যদি চলে আসে কি আর করা যাবে! ভাগ্যে ছিল!

জয়া (ভীত হয়ে): এই তুই খল দরজাটা। আমার সাহস হচ্ছেনা।

দীপক : ভয় পাসনা! আচ্ছা আমি খুলছি।

(দীপক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। তার পেছনে জয়া ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করলো। ওদের দেখে বাবা অবাক হয়ে দাড়িয়ে পড়লো। পাশে থাকা মালতি মাসী ও ঝাটা রেখে হা করে চেয়ে রইল।)

বাবা (অবাক হয়ে) তোমরা কারা?

দীপক (ভয়ে ভয়ে): বাবা, আমরা...

বাবা (হতচকিত হয়ে): দীপু? আর ঐটা কে তাহলে? জয়া?

জয়া (কাঁদো কাঁদো মুখে)-: হু।

বাবা: এইসব কি সং সেজেছিস?

মালতি মাসী (ব্যাপার ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে): আরে! দাদাবাবু, ওরা নাটক দলে যে বোধহয়। (মিথ্যে হেসে দীপক আর জয়ার দিকে তাকিয়ে) কি তাইতো বলো?

বাবা (রেগে)-: এখন বুঝি কাজ বাজ ছেড়ে, পড়াশোনা ছেড়ে নাটক করা হচ্ছে?

জয়া (দীপকের কানে ফিস ফিস করে) দাদা, হ্যা বলে দি? বোকা টা কম খাবো।

দীপক (জয়ার কানে ফিস ফিস করে): আর লুকিয়ে রাখার দরকার নেই বোন। এই দিনটা একদিন না একদিন তো আসতোই।

বাবা (গর্জে)-: কি ফিস ফিস করছিস দুজনে? কানে কথা যাচ্ছেনা?

দীপক: বাবা, আসলে..

মালতি মাসী (মিথ্যে হেসে): আমি যা বললাম সেইটাই। ওরা বলতে ভয় পাচ্ছে।

বাবা: ওদের কে জিগ্যেস করেছি যখন ওদের কেই বলতে দিন।

(জয়া ভয়ে দীপকের হাত চেপে ধরে না বলার ইঙ্গিত করলো)

বাবা (চিল্লিয়ে): তোরা কি বলবি ভালোয় ভালোয় নাকি মেরে হার ভাঙতে হবে?

(দীপক একবার মালতি মাসীর দিকে তাকিয়ে দ্বিধাবোধ করতে লাগলো।)

বাবা: ওনার দিকে কি তাকিয়ে আছিস? (মালতি মাসীর দিকে তাকিয়ে) আপনি সব জানেন নাকি?

মালতি মাসী (আমতা আমতা করে): দাদা শুনুন এবারের মতন ছেড়ে দিন। ছেলে মানুষ আর এইসব করবেনা।

বাবা (গম্ভীর কণ্ঠে)-: আপনি আজকের মতন আসুন। ওদের সাথে আমার আলাদা করে কিছু কথা আছে।

(মালতি মাসী জয়া আর দীপকের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রস্থান করলো।)

বাবা (চিল্লিয়ে): এবার তাড়াতাড়ি বল! আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিস না।

দীপক (দ্বিধাগ্রস্ত ভবে): আসলে বাবা... আমি আর বোন.. মনে.. আমরা নিজেদের পরিচয় গোপন করি। আমি ছেলে হওয়ার জন্যে কেউ আমায় মেকআপ এর কাজ দিচ্ছিলনা আর বোন মেয়ে বলে ওকে ব্যান্ডে নিচ্ছিল না। তাই আমি মেয়ে সাজতে আর বন ছেলে সাজতে বাধ্য হই নিজেদের স্বপ্ন পূরণের জন্য....

(তার কথা শেষ না হতে হতেই তার বাবা তাকে স্বজরে একটা থাপ্পর মারলো। জয়া আর দীপক হতভম্ব হয়ে গেলো।)

বাবা (রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে): নিমকহারাম! আমারটা খাবি, আমারটা পড়বি আর আমার চোখেই ধুলো দিবি? ছেলে মেয়ে সাজছে.. মেয়ে ছেলে সাজছে.. চমৎকার!

জয়া (সাহস জুগিয়ে)-: আমাদের জন্যে কি তুমি..এই সমাজ আর কোনো রাস্তা ছেরেছো বাধ্য হয়ে।

বাবা (বঙ্গ করে হেসে): বাহ! ছেলে, মেয়ে ছেলেদের মতন সাজিয়ে বেড়াবে.. মেয়ে, ওই চাচ্ছরা ছোকরাগুলোর সাথে রাত দিন ঘরে আড্ডা দেবে.. আর আমায় মানতে হবে!

দীপক: বাবা, একবার বোঝার চেষ্টা করো।

বাবা: আর কিছু বোঝা জানার বাকি নেই আমার। আজ থেকে তোদের টাকা পাঠানো বন্ধ। দেখি তোদের কত মুরোদ। বাড়ি ছেড়ে এই শহরে এসে থাকছে লাফাঙাগীরি করার জন্যে!

জয়া (ব্যাকুল হয়ে)-: বাবা! কিন্তু....

বাবা (উচ্চকন্ঠে): চুপ! আজ থেকে তোদের মুখ দেখতেও চাইনা। আমার আর তোর মার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখার চেষ্টাও করবিনা। আর এই ফ্ল্যাট টা? যাহ! তোদের ভিককে দিলাম। ইতর!

(বাবা স্ববেগে বেরিয়ে গেলো। জয়া আর দীপক আটকাতে চেয়েও ব্যর্থ হলো।)

জয়া (সোফার উপর গিটার টা রেখে, তার পাশে বসে, কাঁদতে কাঁদতে): দাদা.. এবার আমাদের কি হবে রে?

দীপক (নিজের পরচুলা খুলে) চিন্তা করিসনা বোন আমরা ঠিক পারবো। (জয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে): আমাদের পারতেই হবে।

জয়া (চোখ মুছতে মুছতে): কিন্তু কিভাবে? বাবা যে আমাদের আর কখনো ক্ষমা করবেনা।

দীপক : ঠিক করবে যখন দেখবে যে আমরা যেইটা করছি সেইটা ভুল না। শেষমেশ আমরা তো বাবা মার ই সন্তান।

জয়া (কাতর হয়ে): তবে ততদিন কি ভাবে চলবে?

দীপক (স্নিগ্ধ ভাবে হেসে): তোর স্কলারশিপের টাকা দিয়ে তোর কলেজের খরচা তো চলে যাবে। তার সাথে দুই একটা টিউশন পরিয়ে নিলি।

জয়া (নিজেকে সামলে নিয়ে): হ্যা তা হতেই পারে। আর তুই?

দীপক - আমার তো পার্ট টাইম কাজটা আছেই। তার সাথে টুক টাক কিছু করে ঠিক দুজনের পেট চালিয়ে নেবো।

জয়া (উদাসীন হয়ে) : আর আমাদের স্বপ্নগুলো? সব শেষ তাইনা?

দীপক (মৃদু হেসে) : তা কেনো হবে পাগলী? আমরা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্যে সমাজের কাছে হার মানবে কেন? কেন নিজেদের সত্তা ছোট করবো? আজ থেকে আর আমরা ছদ্মবেশ নেব না।

জয়া (চিন্তিত হয়ে): তাতে যে আমাদের কেউ সম্মান করবে না। আমরা যে এখনও বৈষমতার শিকার

দীপক : তুই চিন্তা করিসনা। আমরা যদি নিজের মন প্রাণ দিয়ে নিজেদের স্বপ্নকে ভালোবাসি, সমাজ ঝুঁকতে বাধ্য। আমরা ঠিক সফল হবো। আজ থেকে আর আমরা নিজেদের ঠকাবনা।

জয়া (হেসে) : ঠিক। দাদা, আমি তোর পাশে আছি।

(light off)

চতুর্থ দৃশ্য

(কয়েক মাস পর....)

(দীপক ব্যাগে মেকআপের জিনিস গোছাচ্ছে। ইতিমধ্যে জয়া উৎসাহিত হয়ে প্রবেশ করলো।)

জয়া (আনন্দে লাফাতে লাফাতে): এই দাদা! এই দেখ! তাড়াতাড়ি আয়।

দীপক (কাছে গিয়ে): এইতো, বল।

জয়া (একটা ম্যাগাজিন দীপকের দিকে এগিয়ে দিয়ে) এই দেখ আমার নাম ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে।

দীপক (উৎসাহিত হয়ে): আরিবাস! এ তো দারুন ব্যাপার। তবে হঠাৎ?

জয়া: আরে মনে নেই তিন মাস আগে আমি একটা ট্যালেন্ট হুন্ট কনটেস্টে third হয়েছিলাম? এই ম্যাগাজিনটা ওই ইভেন্টটা cover করেছে।

দীপক (পিট চাপড়ে): বেশ বেশ!

জয়া: আর জানিস? আগে যেই ব্যান্ড থেকে আমি মেয়ে বলে আমাকে বের করে দিয়েছিল.. ওরা আবার আমায় ফেরত চাইছে।

দীপক (বিরক্ত হয়ে): না না। একদম ফিরবি না।

জয়া: খেপেছিস নাকি? আমি ভাবছি নিজেরই একটা ব্যান্ড বানাবো। বেশ অনেক জনের সাথে যোগাযোগ ও করেছি।

দীপক : অসাধারণ! বানিয়ে ফেল। এই বলছি আজকে এই খুশিতে পাঠার মাংস হক?

জয়া (আনন্দিত হয়ে) একদম! হক। (দীপকের ব্যাগটা লক্ষ করে): এখন কোথায় বেরোছিস? আজকে তো তোর কাজ নেই।

দীপক : আরে একটা মেকআপের কাজ আছে। সঞ্জীব কাকুকে মনে আছে তো?

জয়া: বাবার বন্ধু যিনি?

দীপক: হ্যা হ্যা। ওনার মেয়ের বিয়ে। শেষ মুহূর্তে মেকআপ আর্টিস্ট আসবেনা বলে দিয়েছে। তাই আমার ডাক পড়েছে।

জয়া (মজা করে): তোর তো খুব popularity বাড়ছে দেখছি!

দীপক : একটা মজার ব্যাপার শুনবি? আমাকে ওনার কাছে কে refer করেছে বলতো?

জয়া (ভ্রু কুচকে): কে?

দীপক (স্বজোরে হেসে): বাবা! আমায় জানাতে বরণ করেছিল। আমি শেষমেশ সঞ্জীব কাকুর পেট থেকে কথা বের করেই ছেড়েছি!

জয়া (বিস্মিত হয়ে): কি বলিস?

(উভয়ই স্বজোরে হাসতে লাগলো)

পতিতা-আর বিবেক

সৌভিক দাস।

চরিত্র ~

[কোন চরিত্রের নির্দিষ্ট নাম রাখা হয়নি, তবু পাঠকদের সুবিদার্থে তাদের একটি করে নাম দেওয়া হয়েছে]

পতিতা: মধ্যবয়সী এক স্বাধীন দেহ ব্যবসায়ী।
বিবেক : তরুণ বয়সি এক যুবক। পতিতার কাল্পনিক স্বরূপ।
প্রথম যুবতী: অল্প বয়সি দেহ ব্যবসায়ী এক তরুণী।
খদ্দের: পতিতার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া মধ্যবয়সি পুরুষ।
দ্বিতীয় যুবতী: প্রথম যুবতী-এর দেহ ব্যবসায়ী বান্ধবী।
যুবতী পতিতা : ১৫-২০ বছর বয়সে পতিতা। অন্য আরেক অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হবে।
মাসী: ৩০ বছর বয়সী,পতিতার ছোটবেলার মাসী।
মেসো: ৪০-৪৫ পতিতার ছোটবেলার মেসো।
পুরুষ: পতিতার বাল্যকালে,৩০-৩৫ বছর বয়সি মেয়ে পাচারকারি।
অনামি খদ্দের- কম বয়সি মূক চরিত্র,প্রয়োজনে “খদ্দের” দ্বারাও অভিনীত হতে পারে।

[পতিতা পল্লী, দিনের বেলা]

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে স্টেজের ডান অংশ জুড়ে পতিতার ঘর, ও বাম অংশজুড়ে বাইরের রাস্তা। ঘরের মধ্যখানে একটি খাটিয়া/উচু টেবিল আছে, খাটের নোংরা বেডশিট, ডানদিকের সামনে একটি কল্পিত আয়না,যার নিচে ড্রেসিং টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের উপর একটা জলের বোতল আর মেকআপ কিট রাখা। স্টেজের একদম মধ্যস্থানে ঘরের কল্পিত দরজা। খাটিয়া/ টেবিলের উপরে পতিতা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছ। পড়নে জমকালো শাড়ি, চুল খোলা অবস্থায়। পাশে খদ্দের গান গাইতে গাইতে নিজের শার্টের বোতাম লাগাতে ব্যস্ত, তার প্যান্টের বেল্ট লাগানো বাকি। ঘরের বাইরের রাস্তায় প্রথম যুবতী, খদ্দেরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, পড়নে শাড়ি/নাইটি]

খদ্দের: (আয়নার সামনে নিজের মুখটা দেখতে দেখতে, ব্যঙ্গ করে বলল) আজকাল এতো তাড়াতাড়ি থেকে যাস কেনো বলতো? খেতে তেটে পাশ না নাকি?
পতিতা: (দুঃখ সুলভ ভাবে হেসে) খদ্দের নেই, টাকাও নেই..।
খদ্দের: এলাকায় নতুন মাল আসলে, পুরনো মাল খদ্দের পাবে না তাইতো নিয়ম। তা… তোর ওই এনজিওরা সাহায্য করে না আর?
পতিতা: যে যতটা পারে তা করে। কিন্তু পারে আর কদিন? দিনশেষে, খদ্দের না আসলে চলে না রে।তাও…
খদ্দের: (বিরক্তির সুরে) এই থাম! তোর মরা কান্না শুনতে আসিনি (পকেট থেকে টাকা বের করে ধীরে ধীরে গুনতে লাগলো) এক, দুই, তিন, চার.. এনে ধর!

[পতিতা হাতে টাকাগুলো নিয়ে গুনতে শুরু করলো]

পতিতা: (বিস্মিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে) একি?এ কথা তো ছিল না!
খদ্দের: যা দিয়েছি তাই নিয়ে খুশি থাক।
পতিতা: (ক্ষিপ্ত হয়ে) তোকে খুশি রাখতে আমি কোন খামতি রাখি?
খদ্দের: টাকার খিদে কমা, বয়স হয়েছে তোর!
পতিতা: (খাটিয়া থেকে উঠে) তোর খিদে তাহলে মেটে না কেন? জানোয়ারের বাচ্চার মত, দেহটাকে ছিড়ে খেতে একটুও বাকি রাখিস না যে। টাকার বেলায় মুতে দিশ!

[খদ্দের, রেগে গিয়ে পতিতাকে সজরে এক থাপ্পর মারলো। এই আওয়াজ শুনে বাইরের প্রথম যুবতী সচেতন হয়ে গেল]

খদ্দের: চপড় চপড় কথা বন্ধ করবি। বেশ্যা বেশ্যার মতন থাক!
পতিতা: (রেগে গিয়ে) তোর বউ জানে? প্রত্যেক মাসে এই বেশ্যা-টার কাছে এসে শরীর গরম করিশ! হারামজাদা, ইতরের বাচ্চা ,কাপুরুষ, থু থু!
[খদ্দের উত্যক্ত হয়ে, পতিতার চুলের মুঠি ধরে তার মুখ খাটিয়া/টেবিলে মিশিয়ে দিল]
খদ্দের: আমি আসা বন্ধ করে দিলে, তোকে কে দেখবে ভেবে দেখেছিস? আর আমি যতজনের সাথেই শুই, তাতে কার কি?
পতিতা: (যন্ত্রণায় কাতর হয়ে) তোদের জন্য তো গর্বের ব্যাপার…তোদের কে বলবে। আমরা করলে যত..
খদ্দের: (চুলটা আরো শক্ত করে ধরে) চুপ! আর একটা কথা বললে এটাই তোর শেষ দিন হবে।

[পতিতা ব্যথায় চিৎকার করতে লাগল। এই আওয়াজে বাইরের প্রথম যুবতী, চিন্তিত হয়ে তার দরজার সামনে এসে "দিদি","কি হয়েছে" ইত্যাদি বলতে বলতে দরজা ধাক্কানো আরম্ভ করল]

খদ্দের:(চুল ছেড়ে) পরদিন থেকে এত কথা শুনবো না।

[মেয়েটির আওয়াজে শঙ্কিত হয়ে, খদ্দের ব্যস্ততার সাথে তার ব্যাগটি কাঁধে নিলো এবং দরজার ছিটকানি খুলে বেরিয়ে যেতে চাইলো । প্রথম যুবতী তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও, পারলো না এবং খদ্দের মঞ্চ থেকে প্রস্থান নেয়। প্রথম যুবতী, পতিতাকে দেখে ঘরের ভেতর ছুটে গেল]

প্রথম যুবতী :(চিন্তিত হয়ে) দিদি.. তুমি ঠিক আছো দিদি? জানোয়ারটা আবার এসেছিল?
পতিতা: (হাঁপাতে হাঁপাতে)একটু… জল দিবি?
প্রথম যুবতী: হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও
[প্রথম যুবতী ড্রেসিং টেবিল থেকে একটি বোতল নিয়ে পতিতার হাতে ধরিয়ে দিল এবং পতিতা সেখান থেকে জল ধীরে ধীরে পান করতে লাগলো]
প্রথম যুবতী: (সহানুভূতিশীল হয়ে) প্রত্যেকটা দিন তোমার সাথে কি অমানুষের মতো ব্যবহারটাই না করে… আজকে একটু বেশি করে ফেললো না?তুমিও বলিহারী! কাউকে ডাকতে পারোনি?
পতিতা: (জলের বোতল টা রেখে)অভ্যাস হয়ে গেছে রে। টাকার জন্য এটুকু না হয় শোইলাম।
প্রথম যুবতী: না! আর আসতে দেবে না ওকে! কোন দরকার হলে আমার কাছে চাইবে।
পতিতা: ধুর পাগলী, ছোটদের থেকে কিছু চাইতে আছে?

প্রথম যুবতী : (আত্মহারা ও আবেগপূর্ণ হয়ে) ছোট বলেই তো বলছি। যবে থেকে এসেছি আমাকে নিজের মায়ের মত আদর করেছ,রক্ষা করেছো। তোমার দরকারে যদি পাশে না থাকি, এর থেকে বড় পাপ আর হয় কি? (আচমকা কল্পনা থেকে বেরিয়ে) ওসব বাদ দাও! তুমি কথা দাও, দিদি ওকে আর আসতে দেবে না!

পতিতা: আরে মা, তুই বোঝ…

প্রথম যুবতী: না না দিদি, আমি কোনো কথা শুনবো না! বলতেই হবে তোমার।

পতিতা: আচ্ছা বাবা কথা দিলাম, আর ওকে আসতে দেব না!

প্রথম যুবতী: এবার কথা দাও, কোনো কিছু দরকার হলে চাইবা!

পতিতা: আমার চাওয়ার কিছুই নেই রে..কিন্তু

প্রথম যুবতী: কিন্তু কি? বলোই না…

পতিতা: (ক্ষণিক শান্ত থেকে) একটু.. কথা বলবি আমার সা..?

[পতিতা বলতে না বলতেই দ্বিতীয় যুবতী এর আওয়াজ পাওয়া গেল, পড়নে শাড়ি/নাইটি। সে প্রথম যুবতী খোঁজে চিৎকার করতে করতে রাস্তা থেকে হেঁটে ঘরের দরজায় এসে ঠেকলো]

দ্বিতীয় যুবতী: (পতিতাকে দেখে বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে) ওমা.. দিদি তোমার একি অবস্থা?

প্রথম যুবতী: বলিস না আর, ওই জানোয়ারের বাচ্চাটা আবার এসেছিল। এইবার গায়ে হাত তুলতেও ছাড়েনি।

দ্বিতীয় যুবতী: বলিস কি? আমাদের ডাক দিলেনা কেন দিদি? কেটে মেরে ফেলতাম শালাকে।

প্রথম যুবতী: আমিও তো তাই বলছি। কোন দরকার হোলেই আমাদের ডাক দেবা।

দ্বিতীয় যুবতী: তাইতো! দিন দিন কি রোগা হয়ে যাচ্ছো। আগে কি সুন্দর চেহারা ছিল তোমার, খাওয়া দাওয়া ঠিক করে করো।

প্রথম যুবতী: (দ্বিতীয় যুবতীতে) চুপ করতো! দিদির এখনো যা রূপ, আচ্ছা খাসা ব্যাটাগুলোকে এক তুরীতে অক্কা খাওয়াবে।

দ্বিতীয় যুবতী: যা বলেছিস! দেখিস না একজন তো দিদির কাছে না এসে থাকতেই পারে না। (পতিতার কাধে হাত রেখে) দিদি গো, আমার ভাত মেরো না কিন্তু।

পতিতা: (হেসে) চুপ কর তো তোরা

[সবাই মিলে হাসাহাসি শুরু করল কিছুক্ষণের জন্য]

পতিতা: (হাসি থামিয়ে) না বাবা, আর অভিশাপ দিশনা।

প্রথম যুবতী: (তোতলাতে তোতলাতে)এই দিদি, তুমি ওর কথা শুনেছ?

পতিতা: কার রে?

প্রথম যুবতী: (দ্বিতীয় যুবতীকে ইঙ্গিত করে) এই মুখপুড়ি যাকে দেখে জ্বলতো!

দ্বিতীয় যুবতী: বললেই হয়, ওই বিশ্ব সুন্দরীর কথা বলছিস। যা রুপের ঘ্যাম মাইরি, তা হয়েছেটা কি ওর?

প্রথম যুবতী: মরেছে!

দ্বিতীয় যুবতী: হ্যাঁ?

প্রথম যুবতী: (স্নিগ্ধভাবে আবেগপূর্ণ হয়ে) হ্যাঁ, মাঝে হঠাৎ শরীর খারাপ করে উঠলো। জ্বর, সারা শরীরে ব্যথা, রোগা হয়ে গেল….

পতিতা: তা হয়েছিল টা কি?

প্রথম যুবতী: (পতিতার কাছে গিয়ে) এইডস গো দিদি এইডস। খদ্দের বেশি টাকা দেবে বলে, কোন কিছু ব্যবহার করতো না মেয়েটা। কেউ কেউ জোরজবস্তিও করত শুনেছি..

পতিতা: আহারে..আর যার টিনটিঙে রোগা ছিল, নিজেকে ঠেকাতেও পারতোনা মনে হয়।

প্রথম যুবতী: (আবেগপ্রবণ হয়ে) কী বীভৎস যন্ত্রণায় ছিল মেয়েটা ঠিক নেই.... দিন দিন রোগটা ওকে খেতে লাগলো...দিদি, কথাটা শোনার পর না,আমার নিজের জন্যই কেমন ভয় করে। ও দিদি আমার কিছু হবেনা তো গো?

[প্রথম যুবতী,পতিতাকে জড়িয়ে ধরল]

প্রথম যুবতী: (ক্রন্দনের পূর্ব মুহূর্তের ছাপ তার মুখে নিয়ে) আমার কিছু হয়ে গেলে? এতগুলো টাকা তখন কে শোধ করবে? বাবা মা-কে যে মেরে ফেলবে ওরা!

পতিতা: (প্রথম যুবতীর মুখ দুহাত দিয়ে তুলে) তুই কি ওর মতন বোকা নাকি? নাকি তোর রূপের ঘ্যাম আছে? কেউ জবরদস্তি করলে ঠেঙিয়ে দিবি শালা গুলোকে! চিন্তা করেনা মা...কিছু হবেনা.. এই দেখ, তোকে দেখে তোর বান্ধবী কেমন চুপ হয়ে গেল।

প্রথম যুবতী: (চোখের জল মুছতে মুছতে দ্বিতীয় যুবতীকে ব্যঙ্গ করে) ওর তো এখন খুশি হওয়ার কথা দিদি.. কিরে কি এত ভাবছিস?

দ্বিতীয় যুবতী: (বিরক্ত হয়ে) ঠাট্টা করিস না তো! একটা মানুষের জীবন, আমার খুশির থেকে বড় নাকি রে?(একটু থেমে) কি জ্বালা! একদিকে এই রোগ, চোরের মতন জীবন নিয়ে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে আরেক চোর এরিয়ায় ঘরে ঘরে টাকা চুরি করে যাচ্ছে।

পতিতা: (চমকে গিয়ে) বলিস কি?

দ্বিতীয় যুবতী: হ্যাঁ! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সে নাকি গল্প করতে খুব ভালোবাসে। গল্প করে সব জেনে নেয়, তারপরে চুরি করে। কি চিটিংবাজ ভাবো!

প্রথম যুবতী: (চমকে উঠে) যাহ!আমি তো কুঠির তালাই দেইনি! কি হবে?

দ্বিতীয় যুবতী: (জিভ কেটে, কপালে হাত রাখে)হে কপাল! আমি তো বলতেই ভুলে গেছি, তোর ওখানে যে খদ্দের এয়েছে।

প্রথম যুবতী: কিহ? তা এইটা আগে বলতে হয় না? এতক্ষণ ধরে বকবক করে যাচ্ছিস! নে এবার চল চল..

[তাড়াহুড়ো করে দুজনে বেরিয়ে যেতে লাগলো, প্রথম যুবতী পিছনে ঘুরে এসে পতিতার সামনে আসলো]

প্রথম যুবতী: দিদি.. নিজের একটু যত্ন নাও।

[প্রথম যুবতী স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় যুবতী রাস্তার উপর অন্য কোন খদ্দেরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল]

[পতিতা উদাস মুখে ঘরেই বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর আয়নার সামনে গিয়ে চুল বাঁধলো, একটু রূপসজ্জা করে, ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, অন্য কোন খদ্দেরের অপেক্ষায়।]

[কিছুক্ষণ পর বিবেক, কুর্তা আর চশমা পরিহিত অবস্থায় দ্বিতীয় যুবতীর পাশ ঘেঁষে হেঁটে যায়, তারপর পতিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় যুবতী, পতিতার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে]

বিবেক: কত নিবি?

পতিতা :কত দিবি?

বিবেক: তুই বল, আমার কাছে বেশি নেই কিন্তু...

পতিতা: আচ্ছা ঠিক আছে ৩০০ দিশ। তুই আয়...

[এমত অবস্থায় দ্বিতীয় যুবতী হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পতিতা বিবেক-কে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো]

বিবেক: (ঘর পর্যবেক্ষণ করতে করতে) ইস.. ঘরটার কি অবস্থা!

পতিতা: যা করতে এসেছিস কর।

বিবেক: থাকিস কি করে এখানে?

পতিতা: এখানে থাকি না।

বিবেক: তা কোথায় থাকিস?

পতিতা: ওই সামনে দিয়ে ডান দিক গে…(পতিতা, বিবেককে চোর ভেবে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করলো) তোর.. তোর এত জেনে লাভ কি রে?

বিবেক: কেন? জানতে পারিনা তোর ব্যাপারে?

পতিতা: অচেনা কাউকে, আমি আমার ব্যাপারে জানাতে পছন্দ করি না।

বিবেক: (একগাল হেসে)আমি মোটেই তোর অচেনা…

[এমন অবস্থায় প্রথম যুবতী, এক অনামী খদ্দের- কে মারতে মারতে দ্বিতীয় যুবতীর কাছে নিয়ে আসে। ঝামেলা করতে থাকে]

[পতিতাও বিবেক উঠে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আওয়াজ গুলি ভালো করে শুনতে লাগল।]

পতিতা:(কটাক্ষসুলভ হেসে) আমার ব্যাপারে শুনতে চেয়েছিলি না? দেখে নে বেশ্যার জীবন।

বিবেক: (সব বোঝার ভান করে) উমমম.. টাকা-পয়সার ঝামেলা মনে হয়।

পতিতা: জবরদস্তি, মারধোর, কত কিছু হতে পারে। কম দেখেছি এ জীবনে?

বিবেক: (উৎসভাবে প্রশ্ন করে) খুন?

পতিতা: কত্ত! বলে শেষ করতে পারবো না...(একটু থেমে) নাম কি তোর?

বিবেক: বিবেক।

পতিতা: সে কি বলবো বিবেক বাবু!এও বছরে, কম মেয়েছেলে তো দেখিনি। কেউ ২০! কেউ ১৬! কেউ কেউ আবার ১২! ১২! ভাবতে পারিস? আর তাদের গিলতে আসে কিছু কীট। কত মেয়েকে তাদের হাতে মরতে দেখেছি। কত্ত মেয়েকে তাদের হাতে মরতে…দেখেছি। কত মেয়েকে মরতে শুধুই…দেখেছি..।

[ক্ষণিক স্তব্ধতা, এ সময় প্রথম যুবতী ও দ্বিতীয় যুবতী ঝামেলা শেষ করে পতিতার ঘরে দরজার ফাঁক থেকে সবকিছু দেখার ও শোনার চেষ্টা করছে]

বিবেক:(ব্যঙ্গ করে) তা যাস না কেন এখান থেকে?

পতিতা: (হেসে) যাব আর কোথায়?

বিবেক: বাপের বাড়ি চলে যা।

[পতিতা হাসতে আরম্ভ করল]

বিবেক: ও… তুই তার মানে এখানেই..

পতিতা: ন্যাহ! এখানে আসা তো অন্যভাবে। আমার বাড়ি ছিল, দূরের এক গ্রামে…বহু দূরে…

[স্টেজের সামনের দিকে পতিতার কল্পনিক দৃশ্য অভিনিত হবে। পিছনের চরিত্র- বিবেক, পতিতা, প্রথম যুবতী ও দ্বিতীয় যুবতী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে]

[মঞ্চের ডান দিক থেকে একটি মেয়ে/ যুবততী পতিতা কিৎকিত খেলতে খেলতে মঞ্চের সম্মুখের মধ্যিখানে প্রবেশ করবে। কিছুক্ষণ পর মাসি ডাক দেবে]

বিবেক:(ব্যঙ্গ করে) তা যাস না কেন এখান থেকে?
পতিতা: (হেসে) যাব আর কোথায়?
বিবেক: বাপের বাড়ি চলে যা।

[পতিতা হাসতে আরম্ভ করল]

বিবেক: ও… তুই তার মানে এখানেই..
পতিতা: ন্যাহ! এখানে আসা তো অন্যভাবে। আমার বাড়ি ছিল, দূরের এক গ্রামে…বহু দূরে…

[স্টেজের সামনের দিকে পতিতার কল্পনিক দৃশ্য অভিনিত হবে। পিছনের চরিত্র- বিবেক, পতিতা, প্রথম যুবতী ও দ্বিতীয় যুবতী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে]

[মঞ্চের ডান দিক থেকে একটি মেয়ে/ যুবততী পতিতা কিৎকিত খেলতে খেলতে মঞ্চের সম্মুখের মধ্যিখানে প্রবেশ করবে। কিছুক্ষণ পর মাসি ডাক দেবে]

মাসি:(হাক দিতে দিতে)ও খুকি…

[ডানদিকের পিছন থেকে মাসির প্রবেশ, পড়নে পুরনো শাড়ি]

মাসি: থাকিস কোই দিনি?
যুবততী পতিতা : এইতো মাসি কাজ বাজ সেরে, একটু খেলছিলাম।
মাসি: ওসব তুই রাখ দিনি, মেসো দেখলে তোরে আস্তা গিলে খাবে!
যুবততী পতিতা : বাসন গুলো তো মাজলাম মাসি।
মাসি: এবার রান্নাবান্না শেখ।
যুবততী পতিতা : হবে টা কি শিখে?
মাসি: (মেয়ের চিবুক ধরে) বিয়া করবি?
যুবততী পতিতা : (উৎসুক হয়ে) বিয়া?
মাসি: তোর মেসো তোর জন্য পাত্তর খুঁজজে রে।বিয়া করবি, বরের সেবা করবি। (ক্ষণিক থেমে) তোর বাপ মা-র কত শখ ছিল, তোর একখান ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়াবে।
যুবততী পতিতা :আমার যে, তোমাকে ছাড়া একা একা লাগবে…
মাসি: আরে তোর বর থাকবে যে! তোরে ভালবাসবে, কলকাতা ঘোরাবে!
যুবততী পতিতা : (তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে) ও মাসি, বরের বাড়ি কলকাতায়?

[যুবততী পতিতা ,মাসির মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো এমতাবস্থায় বাম দিক থেকে মেসো, যার পড়নে লুঙ্গি ও সাধারণ গেঞ্জি এবং পুরুষ, যার পরনে প্যান্ট শার্ট, প্রবেশ করে]

মেসো: (মেয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, পুরুষ কে বলে) এই দেহ বাপ..

[পুরুষ, মেয়েকে খানিকক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণ করে নিল]

পুরুষ: খারাপ না.. কিন্তু..
মেসো: (আর্তনাদ করে) দয়া করে এঁকে নিয়ে যাও বাবা। তোমার এই কাকুর বড় উপকার হয়।
পুরুষ: আরে আমাকে ভাবতে তো দেবেন।
মাসি: (হাতজোড় করে) আমাদের দিকে তাকিয়ে না হয়, ওকে বিয়ে করে নেও বাপ।
পুরুষ: (মেসো কে ইঙ্গিত করে) আচ্ছা, আপনি একটু এদিকে আসুন।

[দুজনে এক কর্নারে চলে গেল]

পুরুষ: (গোমড়া ভাবে) কত নেবেন বলুন এবার।
মেসো: (লাজুক ভাবে হাসতে হাসতে) দেখো বাবা, তুমি যা ভালো বোঝো…

[একটি মূক দৃশ্য চলবে, যেখানে পুরুষ, মেসো ও মাসীর সাথে হালকা বার্তালাপ করে যুবততী পতিতাকে নিয়ে বাম দিক থেকে বেরিয়ে যায়, অপরদিক থেকে মাসি ও মেসো মঞ্চ প্রস্থান করে। এই দৃশ্য চলাকালীন পতিতা সংলাপ সহকারে ঘটনা বর্ণনা করবে।]

পতিতা: (গলা কাঁপতে কাঁপতে) বেচে দিলো!মেসোর জন্য, এত বড় বোঝা হয়ে গেছিলাম আমি? আর মাসি? শেষমেষ বিয়ের টোপ দিলো?(হালকা হেসে) জানতো, আমি রাজি হয়ে যাব। অজানা কোন এক পুরুষ এসে নিয়ে গেল। কোন অচেনা শহরে।

[এরপর পুরুষ, যুবততী পতিতার হাত ধরে মঞ্চে সম্মুখে পুনঃ প্রবেশ করল এবং নিচে ঠেলে নিচে ফেলে দিয়ে, মেয়ে-কে বকাবকি করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর পুরুষ প্রস্থান নিল। এরপর যুবততীপতিতা ক্রন্দনরত অবস্থায়, মাটি ঘেঁষতে ঘেষতে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই দৃশ্য চলাকালীনও পতিতা বর্ণনাকারীর ভূমিকা নেবে]

পতিতা: যাকে স্বামী ভেবে.. বাড়ি থেকে বের হলাম, সে নিয়ে এলোই বেশ্যাপল্লীতে! তুলে দিলো এক মাসির হাতে। তখনকার মেয়েটার কথা ভাবলে বুকটা চিরে ওঠে। তখন সে কত পুরুষের সুখের মাধ্যম। অল্প বয়সে মা বাবা হারালো, মাসি মেসো দিলো ধোকা। শুধুই পেলো দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা।

[ক্ষণিক নীস্তব্ধতা, বাইরের যুবতীরা হতবাক ও আবেগপূর্ণ]

পতিতা: (নিজেকে সংযত করে) তারপর কিছু বছর পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম, নিজের কুটি ভাড়া নিলাম।

বিবেক: বেরিয়ে লাভ কি লো? পরিচয় পাল্টালো কি? ওহ! তুই তো পাল্টানোর চেষ্টাও করিস নি।

পতিতা: কে বলেছে করিনি? জাগায় জাগায় কাজ খুঁজে বেরিয়েছি, কিন্তু বেশ্যা তকমাটার কথা মাথায় ছিল না! কেউ কাজই দিতে চাইল না। যারা দিলো, পরিচয় জানতে পেরে আবার খেদিয়ে দিয় । তাই পেটের টানে আবার ফিরে এলাম।

বিবেক: বাহ! পাঁচ বছর? দশ বছর? কবেকার কথা এগুলো? অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই তোর?

পতিতা: আমি না হয়, না খেয়ে মরতাম। আমার ছেলেটার কি হতো?

বিবেক: ছেলেকে নিয়েই নাহয়...(একটু থেমে) ওহ! তাহলে,ছেলের দিক থেকে ভেবে দেখ, সমাজে কত কথা সহ্য করতে হয় ওকে।

পতিতা: তাহলে কি পেটে মেরে ফেলতাম? জন্ম দেওয়াটাও কি আমার পাপ?

বিবেক: যখন ছেলেটা জিজ্ঞেস করে, "মা মা, আমার বাবা কে?" জবাবও দিতে পারিস না। স্কুলগুলোও তো নেয়না বাপহিন দের।

পতিতা:(গর্বের সাথে)ওর কাছে ওর মা আছে!

বিবেক: (কটাক্ষ করে) ৩০০ টাকায় নিজের শরীর বিলীন দেওয়া, কোনো মা এর পেশা হতে পারে?

পতিতা: (স্নিগ্ধ ভাবে) সব মা-ই কিছু না কিছ বিসর্জন দেয়।আমি না হয় শরীরটা দিলাম। (উঠে দরজার সামনে গিয়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে) আচ্ছা...আচ্ছা, বাইরেও আলাদা কিরে? অল্প বয়স থাকতেই, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই সুযোগ নেয়। রাস্তাঘাটে বের হলে, কচি থেকে বুড়ো কতো লোক একটু ছুঁতে চায়। সেই আন্দাজে তো সব মেয়েই, কারো কারো চোখে বেশ্যা।

বিবেক: ব্যাপারটা এক কি? কিছু পছন্দ না হলেই, নারীরা নিজেদের সমালোচনা নিজেরাই করে। কেমন দ্বিচারিতা ভাব!
পতিতা: এটা পাল্টানো যাবে না! বোঝ!
বিবেক: তোকে আমি, সমাজ পাল্টাতে বলছি না। নিজেকে পাল্টা!
পতিতা: (একদম ভেঙে পড়ে) আর ইচ্ছা করে না রে, আর করে না। আমি থেকে গেছি...
বিবেক: তাহলে সারা জীবন, মানুষের হাসি-ঠাট্টা, গল্পের খোরাক হয়েই থেকে যাবি? ছাড়বি না এই কাজ?
পতিতা: কি করে ছেড়ে দি বল? যতই হোক..
বিবেক: যতই হোক! এই কাজই তোদের পেটে ভাত জোটায়। কাজের সাথে, বেঈমানি করা হবে যে! এটাই তো?
পতিতা: আর বলতো কি? এত বছর ধরে, মায়া পড়ে গেছে।এই ঘর, প্রত্যেকটা গলি, এখানকার বাকি মে....
বিবেক: (পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে) তাহলে চাস টা কি তুই? এক্ষুনি তো বললি এখানে থাকা যায়না।
পতিতা:(হালকা হেসে)কষ্টের কারণগুলো বোঝ! এখানে বা বাইরে..কয়জন সম্মান দিয়েছে? আমার কাজকে, কাজের মতন, কয়জন দেখেছে?
বিবেক: মানুষ বদলাবে না! ওই আশায় থাকিস না....যাবি না এখান থেকে তাইতো? (কটাক্ষ সুলভ ভাবে) তোর চেহারা এরম কেন হয়েছে? ভেবে দেখ।তুই এভাবেই মরবি।
পতিতা: আমি মরি কী বাঁচি তাতে তোর কী? কে তুই?
বিবেক: (গম্ভীর হয়ে) তোর বিবেক রে।বোঝাতে এসেছিলাম তোকে। বুঝলাম, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তনশীল।আমারও ঊর্ধ্বে।

[খুব ধীরে ধীরে সংলাপ বলতে বলতে বিবেক স্টেজের বাইরে বেরিয়ে গেল। পতিতা শুধু তাকেই রইল। এসময় বাইরের প্রথম যুবতী ও দ্বিতীয় যুবতী, পতিতার একাকিত্ব ও পুরনো ঘটনার বিবরণ শুনে বিমর্ষ মুখ ধারন করে রয়েছে]
[নিজের পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে পতিতা হাসতে লাগলো এবং গান ধরল]

[গান]
"আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ"

[প্রথম ও দ্বিতীয় যুবতী এবং পতিতা একত্রিত হয়ে স্টেজের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো]

পতিতা: বুঝলো না কেউ। সাধারণ স্বপ্নের অধিকারী আমরাও, মানুষের হৃদয় আমাদেরও...
প্রথম যুবতী: মানুষকে সম্মান করার কাজটি সহজ হলেও আমরা প্রতিদিন তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছি।

দ্বিতীয় যুবতী: পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেরই বুলি।ভারতবর্ষের ৩০ লক্ষ পতিতার শরীরেই তো তাদের পরিচয়।
পতিতা: হাসি-ঠাট্টার খোরাক থেকে সরে এসে, আমাদের সাধারণ চোখে একটু দেখো, দেখো, দেখো…

[সমবেত গান]

পতিতা: বুঝলো না কেউ। সাধারণ স্বপ্নের অধিকারী আমরাও, মানুষের হৃদয় আমাদেরও…
প্রথম যুবতী: মানুষকে সম্মান করার কাজটি সহজ হলেও আমরা প্রতিদিন তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছি।
দ্বিতীয় যুবতী: পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেরই বুলি।ভারতবর্ষের ৩০ লক্ষ পতিতার শরীরেই তো তাদের পরিচয়।
পতিতা: হাসি-ঠাট্টার খোরাক থেকে সরে এসে, আমাদের সাধারণ চোখে একটু দেখো, দেখো, দেখো…

[সমবেত গান]

“আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ
সে তো এলোনা

যারে সপিলাম এই প্রাণ,মন,দেহ
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ”

বাঁধন হারার কথা

শ্রীমন্ত ভদ্র (শ্রী চন্দন কুমার বৈদ্য)

চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ: দুঃখিত পিতার চরিত্রে - অমর। পিড়িত বা অত্যাচারীত হওয়া নারী বা কন্যা - মল্লিকা। নারী সুরক্ষা কমিটির দুজন মহিলা চরিত্রে - অনুলিপি এবং বিজয়া। ডাক্তারের চরিত্রে - অমিয়। পুলিশের ওসি চরিত্রে - মিলি। অত্যাচারী ব্যক্তির চরিত্রে - প্রতাপ সিং এজরা।

(মঞ্চে হালকা সাদা আলোর ছড়াছড়ি। এর মধ্যে অমর নামের এক ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে এসে অনর্গল প্রলাপ বকছেন, আর নিজের মাথায় বার বার হাত দিয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছিলেন। এই দেখে দুজন নারী সুরক্ষা কমিটির মহিলা অনুলিপি এবং বিজয়া অমরের কাছে এসে জানতে চাইলেন)

বিজয়া: আরে আপনি অমর বাবু না!

অমর: হ্যাঁ আমিই অমর।

বিজয়া: আপনি এখানে এভাবে কাঁদছেন কেন?

অমর: আমার একি সর্বনাশ হয়ে গেলো, এবার আমার কী হবে?

অনুলিপি: এইভাবে কান্নাকাটি না করে খুলে বলুন আপনার কি হয়েছে? এভাবে কাঁদার কারণ কী?
(অমর কাঁদছে আর বলছে, মঞ্চের রং হালকা সাদা থেকে হালকা লাল হয়ে গেছে।)

অমর: কী আর বলবো! আমার অমন মা মরা সরল সাধাসিধে মেয়েটা আর বাঁচবে বলে মনে হয় না। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

বিজয়া: অমর বাবু আপনার মেয়ের নাম কী? আর কী হয়েছে আপনার মেয়ের?
(অমর তাড়াতাড়ি করে বলার চেষ্টা করাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বিজয়া তাড়াতাড়ি জল এনে অমর বাবুর জ্ঞান ফেরান এবং আবারও সেই প্রশ্ন করেন)

বিজয়া:অমর বাবু বলুন কী হয়েছে?
(অমর নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন।)

অমর: আমার মেয়ের নাম মল্লিকা। মল্লিকার মা মারা যাওয়ার পর আমি আর মল্লিকাকে পড়াশোনা করাতে পারিনি অভাবে পড়ে। সংসারের অভাব দেখে মল্লিকা একটা শহরে বাবুর বাড়িতে কাজ করতে যায়। যা মাইনে পেত তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলত।
(অমর বলতে বলতে হঠাৎই থেমে গিয়ে চুপ করে যান। এবং কী যেন একটা অসহায়তার চোখে সবার দিকে চেয়ে রইলেন। বিজয়া আবার অমর বাবুকে বললেন।)

বিজয়া: বলুন না কী হয়েছে ওর সঙ্গে?

অমর: প্রথম দুই - তিন মাস পর্যন্ত মল্লিকা কাজের বাড়ি থেকে ঠিকঠাক ভাবে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু এই মাসে পাঁচ - সাত দিন ধরে বাড়িতে আসছে না দেখে আমি ওর কাজের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

অনুলিপি: তারপর কী হলো?
(অমর একটু জল খেয়ে নেয়। মঞ্চের আলোর রং গাঢ় লাল হয়ে গেছে।)

অমর: আমি পৌঁছে দেখলাম শহরে বাবুটি মল্লিকাকে খুব মারধোর করছে এবং অত্যাচার করছে।
(বিজয়া অমরের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মঞ্চের আলো বদলে আবার হালকা সাদা হয়ে যায়। আর বিজয়া চোখের জল মুছিয়ে অমরকে জিজ্ঞাসা করলেন।)

বিজয়া: তখন আপনি কী করলেন? প্রতিবাদ করেননি?

অমর: মা মরা মেয়েটাকে মার খেতে দেখে আমি এগিয়ে যাই বাঁচানোর জন্য। কিন্তু ততক্ষণে মল্লিকার কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। মল্লিকাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ি। তাই প্রতিবাদ করতে পারিনি।

অনুলিপি: আপনি কীভাবে এই হুমকির সম্মুখীন হন?

অমর: শহরে বাবু আমাকে হুমকি যেন আমি এই সব বাইরে পাঁচ কান না করে চুপচাপ থাকি। তা নাহলে মল্লিকাকে এবং আমাকে মেরে ফেলবে। আমি কোনো রকমে মল্লিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দি। ডাক্তার বাবু বললেন আর একটু দেরি হলে মেয়েটা মরে যেত।
(মঞ্চের আলো নিভে যায় এবং অমর চলে যায়। অনুলিপি বিজয়াকে বললেন)
(মঞ্চের আলো নিভে গেল। এবং দুজনেই বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সাদা আলো জলে উঠলো এবং হাসপাতালের দৃশ্য এল, সেই সঙ্গে অনুলিপির প্রবেশ)

অনুলিপি: এই তো হাসপাতালে এসে গেছি।
(অনুলিপি মল্লিকার রুম খুজে বার করে এবং ডাক্তার সঙ্গে কথা বলেন।)

অনুলিপি: ডাক্তার বাবু মল্লিকা এখন কেমন আছে?

অমিয়: এখন ভালো আছে।
(এর পর পরই বিজয়া হাসপাতালে আসে মল্লিকার সঙ্গে কথা বলার জন্য। অনুলিপি বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন)

অনুলিপি: বিজয়া তুমি এখানে? ওদিকে সবাই তৈরি তো?

বিজয়া: আমি এখনো কমিটি রুমে যাইনি। ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

অনুলিপি: আচ্ছা।
(কিছুক্ষণ পরে বিজয়া নারী সুরক্ষা কমিটির দিকে চলে যায়। মল্লিকার সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে যায়।)

অনুলিপি: ডাক্তার বাবু আমি কী ওর সাথে কথা বলতে পারি।

অমিয়: আচ্ছা! কিন্তু বেশিক্ষণ না।
(অনুলিপি মল্লিকার সঙ্গে কথা বলার সময় মঞ্চের আলো হালকা লাল হয়ে যায়)

অনুলিপি: আচ্ছা মল্লিকা তুমি পরিষ্কার করে খুলে বলো যে, তোমার সঙ্গে কী কী হয়েছে?

মল্লিকা: আমি ওই বাড়িতে প্রথম দিন কাজ করতে গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাড়ির শহরে বাবু ওই প্রতাপ সিং এজরা আমার প্রতি খারাপ আর কুনজরে দেখতো। এই পাঁচ - সাত দিন ধরে আমাকে জোর করে ইঞ্জেকশন দিত আর আর বাড়িতে আসতে দিত না। আমার মারধোর করত।

অনুলিপি: আর কোনো ভয় নেই, আমরা এসে গেছি তোমাকে বাঁচানোর জন্য, তুমি বিশ্রাম করো।

মল্লিকা: ওই প্রতাপ সিং এজরা আমাকে আর আমার বাবাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, এই সব যদি পাঁচ কান হয় তাহলে আমাদের মেরে ফেলবে।

অনুলিপি: তুমি বিশ্রাম করো, আমরা দেখছি।

(অনুলিপি ডাক্তারের সঙ্গে আবার কথা বলতে গেলেন। এবং ডাক্তার বললেন।)

অমিয়: আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি, ওর শরীরে ড্রাগসের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল অতিরিক্ত মাত্রায়।
(ডাক্তারের কথা শুনে অনুলিপি মনে মনে ঠিক করে যে ওই অত্যাচারী প্রতাপ সিং এজরাকে শাস্তি দিতেই হবে। ওর মতো অন্যায় অত্যাচারীকে তো মৃত্যু দন্ড হওয়া উচিত। অনুলিপি বিজয়াকে ফোন করে বলেন সবাই কে নিয়ে যেন এক্ষুনি প্রতাপ সিং এজরার বাড়ির দিকে রওনা দেয়, আমিও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পৌছচ্ছি। মঞ্চের আলো নিভে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে হলুদ আলো। দেখা যায় অনেক মহিলা একত্রে জড়ো হয়ে একদিক দিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে লাগলো আর বার বার বলছে)

সম্মান চাই, পরিচয় চাই, চাই সমাজে জায়গা,
যারা করছে নারীর ওপর অন্যায় অত্যাচার
তাদের শাস্তি চাই, শাস্তি চাই,
আমাদের বিচার চাই, চাই বাঁচার অধিকার
সম্মান আমাদের লজ্জা বস্ত্র, বেঁচে থাকার ইচ্ছে,
তাই হে বঙ্গ নারী জেগে ওঠো, আর উচু করো মাথা---
যারা নারীর লজ্জা নিচ্ছে কেড়ে, তাঁদের বধ করো।
সমাজের মাঝে তুলে ধরো, নিজের শক্তিকে
সম্মান চাই, পরিচয় চাই, চাই সমাজে জায়গা,
দেখিয়ে দাও, আমরা দুর্বল নই,
অস্ত্র হাতে তুলে প্রতিবাদ করতে পারি।।
(মঞ্চের আলো ক্রমশ আর গাঢ় হতে থাকে।)

অনুলিপি: সকলে শোনো মল্লিকার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে মানে আমাদের অপমান করা হয়েছে আর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। সবাই তৈরি তো?
(সকলে মিলে একসাথে বলেন হ্যাঁ অবশ্যই।)

বিজয়া: অনুলিপি ম্যাম আমরা প্রতাপের বাড়িতে এসে গেছি।

অনুলিপি: এখানে দাঁড়াও, আমি কলিংবেল বাজিয়ে ওই অত্যাচারী অপরাধীকে বাড়ির বাইরে বার করছি সবাই তৈরি থেকো।
(অনুলিপি কলিংবেল বাজালে মিনিট দুয়েক পরে প্রতাপ বেরিয়ে আসে এবং সকলকে দেখে প্রতাপ সিং প্রশ্ন করলেন)

প্রতাপ সিং এজরা: আপনারা সবাই মিলে আমার বাড়ির সামনে এমন জমায়েত হয়ে ভিড় করে আছেন কেনো? কারা আপনারা?

বিজয়া: আমরা নারী সুরক্ষা কমিটির সদস্য। (রাগান্বিত কন্ঠে) বিরুদ্ধে আমাদের কাছে নালিশ জমা পড়েছে, তুই মল্লিকাকে অত্যাচার করে পড়েছে, তুই মল্লিকাকে অত্যাচার করে ড্রাগসের ইঞ্জেকশন নিয়ে কষ্ট দিতিস। তোর মতো পাপীর বেঁচে থাকার মানে নেই।

প্রতাপ সিং এজরা: কীসব বলছেন? আমি তো ভালো লোক, আমি কোনো অত্যাচার করিনি।
(নিজ মুখে বিড় বিড় করতে থাকে, একবার যদি মল্লিকা আর ওর বাবাকে যদি পাই তাহলে শেষ করে দেবো।)

অনুলিপি: আমাদের কাছে প্রমাণ আছে তুই মল্লিকাকে মেরে মেরে অত্যাচার করেছিস। আমাদের কাছে ভয়েস রেকর্ডিং আছে যে তুই কেমন ধরনের মানুষ। আর কেমন করে তুই মল্লিকাকে আর মল্লিকার বাবাকে হুমকি দিয়েছিলিস। আর এই প্রমাণ আমি সকল সদস্যদের মোবাইলে দিয়ে দিয়েছি এমনকি ওসি অফিসারকে।
(বিজয়া সবাইকে বলল প্রতাপ সিং কে মারতে। প্রায় মিনিট পাঁচ পর ওসি অফিসার মিলি সেখানে আসে এবং সকলকে বলেন)

ওসি অফিসার মিলি: আরে থামুন থামুন ওকে আর মেরে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না।

বিজয়া: একে মেরে তবে আমরা শান্তি পাবো। একে মেরে ফেললে নারীদের ওপর অত্যাচার শেষ হবে না জানি কিন্তু একটু হলেও কমবে।

ওসি অফিসার মিলি: আমি সব প্রমাণ দেখে শুনেই এখানে এই পাপীকে ধরতে এসেছি। কিন্তু একে লকাপে রাখতে নয়, এনকাউন্টার করে মারতে এসেছি। কারণ এই পাপী আমার সামনে আমার ছোটো বোনের ওপর অত্যাচার করে মেরে ছিলো। আমি দিদি হয়ে সেদিন কিছু করতে পারিনি। আজও আমার ছোটো বোন গোমায় রয়েছে জানিনা ওই অবস্থা থেকে বার হতে পারবে? তাই একে মেরে ফেলে গ্রামের ও শহরের মেয়েদের সম্মান বাঁচাবো।
(অফিসার মিলি পরপর ছয়টি গুলি মেরে প্রতাপ সিং এজরাকে এনকাউন্টার করে মেরে ফেলে। এবং এর সাথে সাথে মঞ্চের আলো নিভে গেলো ।)

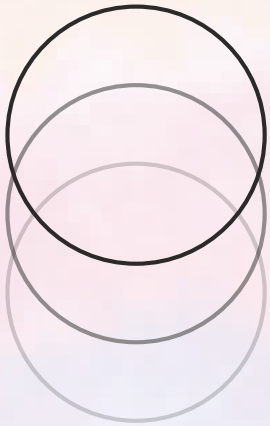

মন চলো নিজ নিকেতনে

শুভ সরকার , সায়নী কুণ্ডু

মূল চরিত্র:
কৃত্তিকা বসু, সুচেতনা
পার্শ্বচরিত্র:
কৃত্তিকার বাবার বন্ধু, সুচেতনার পিসি ও পিসেমশাই, একদল লোক

যারা নিজেদের কথা বলতে বা বোঝাতে পারেন না, যাদের অন্তরাত্মা ও শরীরের মধ্যে নারী-পুরুষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জনিত প্রভেদ, সেই সমস্ত বৈচিত্রময় মানুষ দিয়েই তৈরি আমাদের সমাজ। পুরুষতান্ত্রিক মনন থেকে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতির আকাশে, এই মুক্তমনা পাখিদের প্রতিবাদী জমায়েতের আসর এই নাটকটি।
(মঞ্চের পর্দা উঠলো।
অন্ধকার মঞ্চে স্পটলাইটের নিচে একটি মেয়ে মঞ্চ জুড়ে ঘুরে ঘুরে নাচ করছে।)

কৃত্তিকা— ‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী
(গানের তালে তালে গুনগুন আওয়াজ মুখে)
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি-
(স্পটলাইটের আলো নিভে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা)

কৃত্তিকা—‘কেউ আছেন? কেউ আছেন? কেউ শুনতে পারছেন আমার কথা! দোহাই আপনাদের, সাড়া দিন।
আমি কৃত্তিকা! কৃত্তিকা বসু, চিনতে পারছেন না আমায়! B.Sc,ফাইনাল ইয়ার! আপনার পাড়াতেই তো থাকতাম , শুনতে পারছেন আমার কথা? চিনতে পারছেন? সাড়া দিন। দোহাই আপনাদের, সাড়া দিন।
আচ্ছা ! একটু মনে করুন, এই যে আপনি; হ্যাঁ আপনিই, আমার দিকে লালা ঝড়া চোখে তাকিয়ে আমার বাবাকে বলেছিলেন...’
(স্পটলাইটের আলো জ্বলে উঠলো, তার নিচে একজন মধ্যবয়স্ক লোক)

— ‘আহা, তুমি বুঝচো না ব্যাপারটা বুড়োদা ! তোমার তো বয়স হয়েছে, আর কতদিন খাটবে! এই শরীরটা কদ্দিন সার্ভিস দেবে বলো তো। এবার একটু রেস্ট ফেস্ট নাও! হাওয়া বদল করো। কৃত্তিরও তো বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, সম্বন্ধ দেখা শুরু করোনি এখনো!
কিছু মনে করিস না কৃত্তিকা! তোর বাবাকে আমি আমার বদ্দার মত সম্মান করি, তাই তোর কাকা হিসেবেই বলছি, এসব মাচায় নেচে ফেচে কিসসু লাভ নেই। মাটা তো কবেই মরে গেছে, এবার একটু বাবার দিকে তাকা, ওর বয়সটা দেখ!আর বুড়োদা তুমিও মেয়ের কথায় নাচ্ছো! শেষকালে মেয়েটাকে বাঈজী বানাবে!’
(স্পটলাইটের আলো নিভে গেল। আবার অন্ধকার।)

কৃত্তিকা—'আমার বাবা নির্বিকার হয়ে শুনেছিল আপনার কথা। পাড়ার একমাত্র হোতা আপনি, তাই রাগে অপমানে বাবার হাতের মুঠোটা হাতুড়ির মতো আপনার ওপর আঘাত হানতে চেয়েছিল...কিন্তু আমার কথা ভেবে বাবা কিছু করেনি। চুপ করে মেনে নিয়েছে।
নইলে সেদিন মাচা আর মঞ্চের পার্থক্যটা সহজেই বুঝে যেতেন ।
জীবনে প্রথমবার বাবা আমার জন্য নিয়ম বানালেন। হ্যাঁ, নিয়ম! এই নিয়মের নাগপাশে আমার পা দুটো আটকে গেছে! দেখতে পাচ্ছেন না আমার পা দুটো ! তাকিয়ে দেখুন একবার, কি সুন্দর রক্ত জমাট বেঁধে নীল হয়ে গেছে! আমার অবশ দুটো পা ,অবশ হয়ে যাওয়া ঘুঙুরের শব্দ... শুনতে পারছেন? দোহাই আপনাদের, উদাসীন থাকবেন না, সাড়া দিন।'
(অন্ধকার মঞ্চ জুড়ে কান্না ও ঘুঙুরের মিশ্রিত শব্দ)
(মঞ্চের মাঝখানে স্পটলাইট এর আলো জ্বলে উঠলো। আলোর নিচে একটা টেবিল এবং একজন ত্রিশ বছরের মহিলা।)

সুচেতনা— 'নমস্কার, আমি সুচেতনা। না, জীবনানন্দের সঙ্গে আমার নামের ব্যুৎপত্তির কোন সম্পর্ক নেই।
কলেজে বাংলা পড়াই, তাই পেশাগত কারণে তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও জন্মের সময়ে আমার নামকরণ করেছিলেন যারা, মানে আমার পিসি পিসেমশাই, এটা ছিল তাদের কথায় অনিচ্ছাকৃত ভুল আর এই ছোট্ট ভুলটার জন্যই আমি হয়েছি তাদের কাছে খলচরিত্রের সম্রাজ্ঞী।
কেন ভুল কেন? কেনই বা ভিলেন! প্রশ্ন উঠতেই পারে!
তাদের কিন্তু অভিযোগ গুরুতর। কারণ পিসি বলেছেন...'
(স্পটলাইটের আলো তৎক্ষণাৎ নিভে গিয়ে সুচেতনার বাম পাশে জ্বলে উঠলো, তার নিচে একজন মধ্যবয়স্কা)

—'চাল চুলোর ঠিক নেই! আমাদের ঘাড়ের উপর গচ্ছে দিয়ে গেছে আপদটাকে... আবার ছেলেদের মত চুল ছোট করেছে, জিন্স প্যান্ট শার্ট পড়ছে, ওগো! দেখো শুনছো! এসে দেখে যাও ফিরিঙ্গি মেয়েছেলেটা কী অবস্থা করেছে !'
(স্পটলাইটের আলো তৎক্ষণাৎ নিভে গিয়ে সুচেতনার ওপর পড়লো)

সুচেতনা- 'এদিকে ধর্ম ও ভারতীয় সাংস্কিতী (সংস্কৃতি) নাশের ভয়ে পিসেমশাই বললেন...'
(স্পটলাইটের আলো তৎক্ষণাৎ নিভে গিয়ে সুচেতনার বাম পাশে জ্বলে উঠলো, তার নিচে একজন মধ্যবয়স্ক)
—'এই জন্য তোমাকে পই পই করে বারণ করেছিলাম। এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগেনা। বেজাতের বন্ধুদের সঙ্গে মিশলে তো এটাই হবে, গাঁজা মদ খাবেই। আমি বলেছিলাম ওর ফরেনার বাপকে ওই সমস্ত টেরোরিস্ট কলেজে মেয়েকে ভর্তি না করাতে, তখন শুনলো না আমার কথা! নাহ! মেয়ে নাকি প্রগতিশীল হবে। নেহাত তোমার ভাইঝি বলে, রুনু হলে এতদিনে একদম চাবকে সিধে করে দিতাম।'

(স্পটলাইটের আলো তৎক্ষণাৎ নিভে গেলো। আবার গোটা মঞ্চ অন্ধকার। কে যেন আবার ক্লান্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। মঞ্চের মাঝখানে স্পটলাইটের আলো পড়লো। আলোর নীচে কৃত্তিকা শুয়ে আছে। উস্কো খুস্কো চুল, এলোমেলো কাপড়। চোখের কাজল ধেবড়ে গেছে।)
(অবাক চোখে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল একবার দর্শকের দিকে। তারপর আপন মনে গুনগুন করতে লাগলো)

কৃত্তিকা— 'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি...মন বান্ধিবি কেমনে? আমার চোখ বান্ধিবি, মুখ বান্ধিবি
পরান বান্ধিবি কেমনে?'
(সে এক মনে তার দু পায়ের ঘুঙুর দুটো বাঁধছে আর গান ও মাঝে মাঝে গুন গুন করছে। ঘুঙুর বাধা শেষ হয়ে গেলে সে উঠে দাঁড়ালো।)

কৃত্তিকা— 'সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের গোটা পাড়া বর্ষার জলে ভেসে গেছে। বাইরে অবিরাম ঝমঝম... ঝমঝম... বৃষ্টি। আমার ঘরে... আমার পাশে বাবার ঘরে, এই একই আওয়াজ, কোথাও কোনো টু শব্দ নেই। এরমধ্যে বাবা মারা গেলেন। আমার ওপর একটা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ল, অথচ পাশের ঘরে থেকে আমি বুঝতেই পারলাম না।
কী করবো? কোথায় ঘুরে দাঁড়াবো? পায়ের তলায় মাটিতো নেই আর। বাবার শরীরটা যত দ্রুত ঠান্ডা হচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম আমার দিকে.... আমার দিকে কতগুলো চোখ দুঃস্বপ্নের মত তাকিয়ে আছে। আমার অন্তর আত্মা ভেতর থেকে চিৎকার করে বলছিলো
(স্পটলাইটের আলো নিভে গেল। আবার অন্ধকার।)

আমি থাকতে চাই না এখানে... হে ভগবান! দোহাই তোমার, আমি আর পারছি না। প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা ঘন্টা ওই চোখগুলো আমার উলঙ্গ দেহটা দেখতে চায়। কুরে কুরে খেয়ে দেখতে চায় নরম মাংসের স্বাদটা, মেয়ে মানুষের শরীরের স্বাদটা ঠিক কেমন...।'
(মঞ্চের মাঝখানে স্পটলাইটের আলো জ্বলে উঠলো ।
আলোর নিচে সুচেতনা)

সুচেতনা—'গায়ে হাত তোলার কথাটা সেদিন গায়ে লাগেনি, মনে লেগেছিল। তাই বিন্দুমাত্র কিছু না ভেবেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। একা একাই। তারপর আর ওই রাস্তায় ফিরিনি কখনো। অবশ্য গায়ে হাত তুলতে আমার পিসি, পিসেমশাই কোনদিনই পারতেন না। বিদেশী টাকার জোরটাই এরকম, হিংস্র জানোয়ারকেও পোষ্য বিলিতি কুকুর বানিয়ে দেয়! সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন! রুনুর জন্য মনটা এখনো খারাপ হয়ে যায়। অনেকদিন ওকে দেখিনি, জানিনা ও কেমন আছে! এখন বোধহয় ক্লাস টেন।

সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আপনারা! সুধী দর্শকমন্ডলী ! কান দুটো চোখ দুটো খুলে শুনুন! তাকিয়ে দেখুন একবার। ভারতের ১৯টা শহরের মধ্যে কলকাতাকে সবচেয়ে নিরাপদ ঘোষনা করার পরেও... এরপরেও কলকাতার নিকটবর্তী সন্দেশখালিতেই ...। '
(দর্শক আসনের কয়েকজন চুপ করার শব্দ করলো।
গোটা মঞ্চের আলো জ্বলে উঠলো। কৃত্তিকা সুচেতনার হাত ধরল।)

সুচেতনা— 'চুল আমার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার মতো দেখতে একেবারেই নয়। আমার মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য বেমানান। আমি খুব সাধারন একজন, আপনাদেরই ফ্ল্যাটের অথবা পাড়ার কেউ। এইমুখটা চেনা হতে পারে অথবা অচেনা একজন সাধারণ মেয়ে...'
(মঞ্চের বাঁ দিক থেকে একটা সারিবদ্ধ দল চক্রাকারে ওদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াতে লাগল।)

কৃত্তিকা— 'আমাদের ভাবতে দিন! আমাদেরও বাড়তে দিন! আর কতদিন অন্ধকারে ঢিল ছুড়বেন, জোনাকি হওয়ার স্বপ্ন কি শুধু আমরাই দেখি! আপনারা দেখেন না?
(দর্শক আসন থেকে নিঃশব্দে কয়েকজন ওই বৃত্তের পরিধিতে দাঁড়াবে। বৃত্তের বিন্দুতে একটি পতাকা উত্তোলিত হবে।)

সমবেত কণ্ঠে গান—

"দিনে দিনে বাড়ল দেনা,
ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা--
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে--
ওরে, দে খুলে দে,পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।"

প্রতিবাদ

লাবনী সরকার

নাটকের কুশীলবগন – সন্ধ্যা, নিশা, চন্দ্রা (তিন বান্ধবী) ,
সবিতা (চন্দ্রার মা ও একজন এনজিও কর্মী) ,
অনির্বাণ (চন্দ্রার বাবা) ।
অন্যান্য গৌন চরিত্র – নিশার বাবা ও মা, পুলিশ (বড়ো বাবু) কনস্টেবল (দত্ত),
বাসযাত্রী লোকটি, একজন ১৩-১৪বছরের মেয়ে,
বাসযাত্রী ১ম জন (পুরুষ) ,২য় জন (মহিলা),৩য় জন (যুবক) , সবিতার (বাবা)

প্রথম দৃশ্য

(কলেজের ফাঁকা ক্লাসরুমে নিশা একা বসে আছে ।এমন সময় সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা: কীরে এখানে একাএকা বসে আছিস কেন নিশা? কী হয়েছে?
নিশা: (হতাশার স্বরে) আর কীইবা হবে ! রোজ যা হয় তাই । ওই লাভ ক্ষতির হিসাব । কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তো শুনছি “মেয়েমানুষের অত লেখাপড়া করে কী হবে ? তাড়াতাড়ি ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেই তো হয় , ঘরে বসে বয়স বাড়িয়ে কী লাভ? “জানিস সন্ধ্যা বাবা মা যদি আমার পাশে থাকতো, তবে বাইরের লোকের কথায় আমার কিছু যায় আসতো না । নিজের বাবা, মা- ই যদি মেয়েকে বোঝা ভাবে, তবে বাইরের লোকদের আর দোষ কোথায়? প্রতিদিন এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি । (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো) আমার ভাগ্যটাই এমন ।
সন্ধ্যা: তা কী করবি বলে ঠিক করলি ?
নিশা : তাই তো ভাবছি ।
সন্ধ্যা :তোর দাদার বেলাতেও কি একই হিসেবে নিকেষ চলছে?
নিশা: না । দাদা তো ছেলে , পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবে । বাবা মায়ের সব স্বপ্ন তো ওকেঘিরেই।
সন্ধ্যা: শুধুতোর দাদাকে নিয়েই কেন? তোকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন নেই?
নিশা: না ।(অভিযোগের স্বরে) আমি তো মেয়ে , আমার তো কোনো স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই । আমাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা তো বৃথা ।(হতাশার স্বরে)জানিস, আজ মাকে আমি , এই প্রশ্নই করেছিলাম । উত্তরে আমাকে বলল “তুমি তো মেয়ে । মেয়েদের একটাই পরিণতি শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সংসার করা । তাতে পড়াশোনার কোনো প্রয়োজন নেই । আমাকে দেখছিস না । আমি তো ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি , তোর মতোন অতো পাশ দিইনি , তার পর পনেরো বছরে বাবা বিয়ে দিলো । বেশি পড়াশোনা করিনি বলে কি কিছু আটকে আছে আমার জীবনে ? তাহলে তোর এতো সমস্যা কিসের ? “
সন্ধ্যা: (রেগে গিয়ে ,ব্যঙ্গ করে) সত্যিরে তোর মায়ের মতো মানুষের পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত । (রেগে গিয়ে) কোথায় তোর পাশে থাকবে তা নয়, যে ভুল নিজে করেছে , সেই একই পথে তোকে ঠেলে দিচ্ছে । কেমন মা উনি ।
(দুই জনের কথোপকথনের সময়,চন্দ্রার প্রবেশ ।)
চন্দ্রা:কীরে তোরা এখানে , আমি ভাবলাম বাড়ি চলে গেছিস ।
নিশা : কিছু বলবি ?

চন্দ্রা: হ্যাঁ। ভীষন জরুরী বিষয় । মা আবার একটা মেয়েকে বাঁচিয়েছে ।
সন্ধ্যা : তাই নাকি ! কাকিমার এনজিও কিন্তু খুব active। তা এবারের কেসটা কী? বধূ নির্যাতন ?
চন্দ্রা : না । একটা মেয়েকে যৌন পল্লী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ।
নিশা : উদ্ধার ? মানেটা বুঝলাম না ?
চন্দ্রা : মানেটা হলো গিয়ে , যদি স্বেচ্ছায় যৌনকর্মী হিসেবে নাম লেখাতো তাহলে উদ্ধারের প্রয়োজন হতো না । কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা।
নিশা : [চিন্তিত ভাবে] আলাদা ব্যাপার ? কীরকম ?
চন্দ্রা :মেয়েটা নারী পাচার চক্রের শিকার হয়েছে ।
সন্ধ্যা : [উত্তেজিত ভাবে] বলিস কী ? মেয়েটা এখন কেমন আছে ? মুখ খুলেছে ? মেয়েটার নাম কী ? কোথায় থাকে ?
নিশা : উফ্। তুই না সন্ধ্যা ।
সন্ধ্যা: আমি কী?
নিশা : সবসময় এতো উত্তেজিত হয়ে যাস না তুই । একটা একটা করে প্রশ্ন কর । একসাথে এতগুলো প্রশ্ন করলে চন্দ্রা উত্তর দেবে কীভাবে শুনি ?
সন্ধ্যা : ও ও sorry রে । (উত্তেজিত হয়ে) এই চন্দ্রা তুই থামিস না বলে যা। মেয়েটা কি কিছু বলেছে ?
নিশা : ওই দেখ আবার উত্তেজিত ।
সন্ধ্যা : দুর ছাই । তোরা তো জানিস এটা আমার স্বভাব । এই চন্দ্রা, তুই বলতো ।
চন্দ্রা: হুঁ । সবটা না বললেও কিছুটা বলেছে । আসলে ওর মানষিক অবস্থা ভালো নয় ।তবে ও যা বলেছে তাই নিয়েই পুলিশ investigation শুরু করে দিয়েছে ।
নিশা : মেয়েটা এখন কোথায় আছে রে ? কাকিমা মেয়েটার বিষয়ে আর কিছু বলেছে তোকে ?
চন্দ্রা:হুঁ ।
সন্ধ্যা : উফ্! এতো ভনিতা না করে তাড়াতাড়ি বল না, কী জানিস ।
চন্দ্রা : (হেসে হেসে উত্তর দিল) মেয়েটার নাম চৈতালি । গ্রামের মেয়ে , বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল প্রেমিকের সঙ্গে কলকাতায়।[এবার ব্যঙ্গের স্বরে] আর সেই মহাপুরুষ প্রেমিকটি ছিল নারী পাচারকারীদের একজন ।
সন্ধ্যা : বলিস কী চন্দ্রা !
চন্দ্রা: হুঁ । মহাশয়ের কাজই হলো মেয়েদের সাপ্লাই করা । যেমন কলকাতায় নিয়ে এসে বেচে দিল চৈতালিকে । তারপর ওর ঠিকানা হল যৌনপল্লীতে , আর পরিচয় হল যৌনকর্মী । মেয়েদেরও যেমন ভাগ্য !
নিশা : (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে) সেটাই !
সন্ধ্যা : এখন কোথায় আছে চৈতালি?
চন্দ্রা : পুলিশ ওকে হোমে রেখেছে । বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরিবারের কেউই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না । লোকের কাছে নাকি মুখ দেখাতে পারবে না ।
সন্ধ্যা : পুরো নিশার বাবা মায়ের মতো । নিজের মেয়ের থেকে লোকজন আর সমাজের গুরুত্ব বেশি এদের কাছে ।

নিশা : (হতাশার স্বরে)ঠিক বলেছিস । মেয়েরা তো আর মানুষ নয় । সবার হাতের পুতুল, যেমন নাচাবে তেমন নাচতে হবে,না হলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।
চন্দ্রা : এখনই এতো ভেঙ্গে পড়ছিস কেন ? আমি মা কে বলেছি তোর বিষয়ে । মা কাল বাড়িতে থাকবে , তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।
নিশা : আবার কাকিমাকে বিরক্ত করা কেন ?এমনিতেই এনজিওর কাজে দিন রাত ব্যস্ত থাকেন ।
চন্দ্রা : এই শোন , 'তোর কাকিমা 'মোটেই বিরক্ত নন। বরং আমি এতদিন পর জানালাম বলে বকা খেলাম । আচ্ছা চলি , কাল তাহলে কলেজের পর তোরা দুজন আমার বাড়ি যাবি ।
সন্ধ্যা :ঠিক আছে ।
(নিশা , সন্ধ্যা , চন্দ্রার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলেজ শেষে সন্ধ্যা, নিশা ও চন্দ্রা ফুটপাত ধরে হাঁটছে , বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্য । গন্তব্য চন্দ্রার বাড়ি)
চন্দ্রা : তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল নাহলে বাসটা ধরতে পারবোনা ।
নিশা : না না বাসটা ছাড়ার আগেই পৌঁছে যাবো।
(তিনজনের বাসে ওঠার পর)
সন্ধ্যা : [নিশা ও চন্দ্রাকে উদ্দেশ্য করে] এই ,ওই লোকটাকে দেখ , সামনের ওই বাচ্চা মেয়েটার গায়ে ইচ্ছে করে হাত দিচ্ছে ।
চন্দ্রা : কোন লোকটা রে ?
সন্ধ্যা : আরে , নিশার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে , হলুদ জামা পড়া লোকটা ।
নিশা : হ্যাঁ তো ! ইসঃ লোকটা কী অসভ্য ।
চন্দ্রা : এই নিশা, তুই এদিকে আয় , আমি তোর জায়গায় দাঁড়াবো ।
নিশা : এই তুই এখানে দাঁড়াবি কেন ? বাসে এতো লোকজনের মধ্যে সিনক্রিয়েট করিস না ।
চন্দ্রা : লোকটা ইচ্ছাকৃত ভাবে বাচ্চা মেয়েটার সাথে এতো লোকজনের মধ্যে অসভ্যতা করেছে তাতে কিছু না , আমি প্রতিবাদ করলেই সিনক্রিয়েট ?
সন্ধ্যা : তাইতো । তুই থাম নিশা , প্রতিবাদ যখন করতে পারিস না, তখন অন্য কেউ করলে বাঁধা দিস না । এর একটা প্রতিবাদ করা দরকার , কেন ঘরে – বাইরে সবসময় মেয়েরাই হেনস্তা হবে ? এই নিশা তুই এদিকে আয় , চন্দ্রা চলতো দেখি ।
(এবারনিশার স্থানে চন্দ্রা , এবং চন্দ্রার পাশে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে আছে)
চন্দ্রা : এই যে দাদা শুনছেন ।
বাসের লোকটি : আমাকে বলছেন ?
সন্ধ্যা : হ্যাঁ আপনাকেই বলছে ।
বাসের লোকটি: হ্যাঁ বলুন ।
চন্দ্রা : আপনি মেয়েটার গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন ?
বাসের লোকটি- (অবাক হওয়ার ভান করে) কই ? এসব আপনি কী বলছেন ? আমি কখন গায়ে হাত দিলাম ! তাছাড়া ও আমার মেয়ের মতো ।

সন্ধ্যা : (ব্যঙ্গের স্বরে) এইরে, আপনি তো দেখছি আকাশ থেকে পড়লেন ! আহারে কী ইনোসেন্ট ।

চন্দ্রা : আমরা বাসে ওঠার পর থেকেই দেখছি আপনি মেয়েটার গায়ে ইচ্ছে করে হাত দিচ্ছেন । এখন সাধু সাজছেন । আচ্ছা আপনি কিছু করেননি তাহলে মেয়েটা কাঁদছে কেন ?

বাসের লোকটি: কাঁদছে কেন তা আমি কি করে জানবো ?

সন্ধ্যা : জানে না ? তাহলে যে কাঁদছে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি । [মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে) আচ্ছা বোন সত্যি করে বলোতো ওই লোকটা তোমার গায়ে , (বুকে) হাত দিচ্ছিল, তাই না ? তোমার কোন ভয় নেই বলো আমাদের । কী করছিলো তোমার সঙ্গে ? বলো ।

বাচ্চা মেয়েটা: [কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল] হ্যাঁ ওই কাকুটা তখন থেকে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে । আমাকে বিরক্ত করছে।

(লোকটা বাস থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে , এমন সময় ...)

১ম যাত্রী (পুরুষ) : [লোকটার জামার কলার ধরে] এই যে মশাই , আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ওই টুকু একটা মেয়ের সাথে অসভ্যতা করেছেন আবার ধরা পড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন ।

২য় যাত্রী (মহিলা) : আপনি না কিছুক্ষন আগে বললেন ও আপনার মেয়ের মতো , তা আপনি বুঝি নিজের মেয়ের সাথে এরকম করেন ?

৩য় যাত্রী (যুবক) : অত কথায় কাজ কী ?

[লোকটাকে মারতে উদ্যত] নোংরামি করার আর জায়গা পাওনা ।

(লোকটাকে , দুই – তিন জন যাত্রি উত্তম মধ্যম প্রহার করেছে, এমন সময় ...)

চন্দ্রা : মেরে আর কাজ নেই, সামনে স্টপেজে নেমে ওনাকে পুলিশে দিতে হবে।

কন্ডাক্টর: ঠিক বলেছেন দিদি । সামনের স্টপেজে ডাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলছি । এই ধরনের বদমাইশদের শাস্তি হওয়া উচিত , দ্বিতীয়বার এমন কিছু করার আগে যাতে দশবার ভাবে ।

বাসের লোকটি: (অনুরোধের সুরে) না , না আমাকে পুলিশে দেবেন না । আমি এমন আর করবো না । সত্যি বলছি, এমন আর কখনো করবো না। দয়া করুন, আমাকে পুলিশে দেবেন না।

সন্ধ্যা : (বাসের অন্যান্য যাত্রিদের কে উদ্দেশ্য করে) আমরা তিনজন যাচ্ছি থানায় , আপনারা কি কেউ যাবেন?

{ উত্তরে কয়েক জন যাত্রী বলেছেন – হ্যাঁ অবস্যই যাবো }

(স্টপেজে বাস থামলো , ওরা তিন জন বান্ধবী মেয়েটিকে নিয়ে নামলো , সঙ্গে কয়েকজন বাসযাত্রী লোকটিকে নিয়ে নামলো , গন্তব্য পুলিশ স্টেশন)

(থানায় প্রবেশের সময়)

নিশা: এই চন্দ্রা, বলছি শুধু শুধু পুলিশের ঝামেলায় জড়ানোর কি খুব দরকার ছিল ? লোকটা তো বললেন এমন আর করবো না । ছেড়ে দেনা ।

সন্ধ্যা : (বিরক্তির স্বরে)এই তুই থামবি । সব সময় সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না । তাছাড়া উনি এখন এমন বলেছেন , কাল আবার এইধরনের ঘটনা ঘটবে না তার কি কোনো গ্যারেন্টি আছে ? একটা শিক্ষা হওয়া উচিত । আজ অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ঘটেছে, কাল যদি তোর সাথে ঘটে তখন কি আমরা চুপ করে থাকবো ,ঝামেলায় জড়ানোর ভয়ে ।

চন্দ্রা: বাইরে আর দাঁড়িয়ে থাকিস না, ভেতরে চল।

বড়ো বাবু (পুলিশ): বলুন কী সমস্যা আপনার?

চন্দ্রা : স্যার, আসলে সমস্যাটা কোনো একজনের নয় ,সব মেয়েদের ।

পুলিশ : সব মেয়েদের ? মানেটা বুঝতে পারলাম না ।

চন্দ্রা : আসলে স্যার , আজ বাসের মধ্যে আমাদের সামনে এই মেয়েটির সাথে অসভ্যতা করছিল ,(লোকটিকে দেখিয়ে) এই লোকটা । আবার প্রথমে উনি অস্বীকার ও করেন । আজ এই মেয়েটির সাথে হয়েছে ,কাল আমাদের যে কারোর সঙ্গে ঘটতে পারে, তাই সমস্যাটা শুধু ওর একার না প্রত্যেকটা মেয়ের ।

বড়ো বাবু : হুঁ , বুঝলাম । যৌন হেনস্থার কেস । আপনারা ডাইরিটা লিখুন আমি দেখছি, (কনস্টেবল কে উদ্দেশ্য করে) দত্ত , মেয়েটির বয়ান রেকড করো । আর আপনাদের নাম , ঠিকানা ও ফোন নম্বরটা দিয়ে যাবেন ,যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাদের এখানে আসতে হতে পারে । লোকটাকে আমরা হেফাজতে নিচ্ছি ।

সন্ধ্যা : ঠিক আছে স্যার । আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনাদের কাজে সহযোগিতা করতে। ধন্যবাদ স্যার, আমাদের সাহায্য করার জন্য।

বড়ো বাবু (পুলিশ) : এতে ধন্যবাদের কী আছে ! আমাদের এটা কর্তব্য আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

চন্দ্রা : তাহলে আসছি স্যার ।

বড়ো বাবু (পুলিশ) : হ্যাঁ , আসুন ।

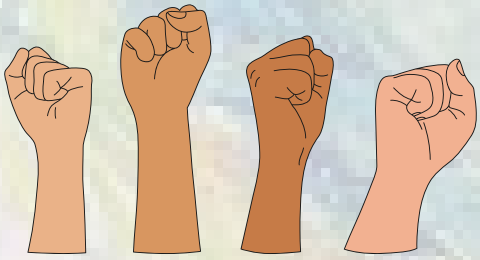

তৃতীয় দৃশ্যে

(স্থান – চন্দ্রার বাড়ি)
[ঘরে ঢোকার মুখে তিন জন দাঁড়ালো , ঘরের ভিতরে সোফায় বসে অনির্বাণ কবিতা পাঠ করছে ।]
(আমি সেই মেয়েটি)
আমি সেই মেয়েটি
সেই মেয়েটি যার জন্মের সময় কোন শাঁখ বাজেনি।
জন্ম থেকেই যে জ্যোতিষীর ছকে বন্দী
যার লগ্ন রাশি রাহু কেতুর দিশা খোঁজা হয়েছে
না নিজের জন্য না
তার পিতার জন্য
তার ভাইয়ের জন্য
তার স্বামীর জন্য
তার পুত্রের জন্য
যার গর্ভে থেকে আমার জন্ম সেই
মায়ের কথা বলেনি কেউ।
আমি সেই মেয়েটি
যে জন্ম থেকেই বিবাহের জন্য বলি প্রদত্ত।
তার বাইরের চেহারা – চোখ,নাক, মুখ -ত্বক
চুল রঙ নিয়েই কেবল দরকষাকষি
কালো না ফর্সা
খ্যাঁদা না টিকালো
লম্বা না বেঁটে
কুতকুতে না টানা টানা
যার মাথায় বাইরের জন্যই সকলের ভাবনা
মাথার ভিতরটা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই।
একাদশীর দিন অবুঝ দশমী বালিকার তৃষ্ণায়
আটক ঘরের মাটি লেহন করতে করতে
প্রান ত্যাগ করেছি
সন্তানের পর সন্তান জন্ম দিতে দিতে
রক্ত শূন্যতায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল সূতিকাগারে ।
জ্বলে পুড়ে মরেছি সতীদাহে।
আমি বুঝতে পারিনি যে
আমার প্রেমিককে তার প্রেমপত্রের বানান ভুল গুলো
ধরিয়ে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল ।
আমি বুঝতে পারিনি যে

আমি যদি কবি হতে চাই
আমার বন্ধুরা বলবেন –
ওটা কবিতা হয়নি – পদ্য হয়েছে।
আমি বুঝতে পারিনি যে
একবিংশ শতাব্দীর সীমানায় এসেও
এই পুরুষ শাসিত পৃথিবী বুদ্ধিমতীদের জন্য অপ্রস্তুত,
(হঠাৎ আবৃত্তি থেমে গেল)

অনির্বাণ : তোরা কখন এলি ? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আয়।
চন্দ্রা : দারুণ বাপি ! তোমার মুখে এই কবিতাটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।
নিশা : বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার আবৃত্তি শুনছিলাম, অসাধারণ। তবে থামলেন কেন? কবিতাটা শেষ করুন ।
অনির্বাণ : না এখন আর না । তোদের সাথে একটু গল্প করবো। কবিতাটা তো আমি যখন তখন আবৃত্তি করতে পারবো । কিন্তু তোরা তো আর সবসময় আসবি না ।
সন্ধ্যা : আচ্ছা , কাকাবাবু আমি এর আগে ও আপনাকে অনেকবার এই কবিতাটাই বলতে শুনেছি । এটা কি আপনার প্রিয় কবিতা ?
অনির্বাণ : হ্যাঁ , ঠিক ধরেছিস । এটা আমার খুব প্রিয় কবিতা । তাই মাঝেমধ্যেই একটু আবৃত্তি করি । মেয়েদের যন্ত্রনার কথা এর প্রতিটা শব্দের মধ্যে যেন গাঁথা আছে । যতবার পাঠ করি, ভিতর থেকে যেন পুরুষতন্ত্রের প্রতি একটা প্রতিবাদ গর্জে ওঠে । এই দেখো তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস । (চন্দ্রার মাকে উদ্দেশ্য করে) এই সবিতা দেখো কারা এসেছে ।
(খাবারের প্লেট নিয়ে সবিতার প্রবেশ)
সবিতা : আর ডাকতে হবে না , আমি এসে গেছি ।
সন্ধ্যা : কাকিমা এসবের কী দরকার ছিল ?
সবিতা : শোনো কথা মেয়ের । কটা বাজে খেয়াল আছে ? পাঁচটা বাজতে চললো ,কখন কী খেয়েছিস, এখনো খিদে পায়নি তোদের ?
চন্দ্রা : হুঁ , খিদে তো পেয়েছে একটু একটু ।
সন্ধ্যা : (উত্তেজিত স্বরে) ও খাওয়া দাওয়া পরে হবে ক্ষন , কাকিমা তুমি জানো আসার সময় কী হয়েছে রাস্তায় ?
সবিতা : (চিন্তিত ভাবে) কেন ? কী হয়েছে শুনি?
সন্ধ্যা : জানো , বাসের মধ্যে একটা মেয়ের সঙ্গে অসভ্যতা করছিল একটা বদমাশ লোক। আমরা ধরেছি বদমাশ টাকে । উচিত শিক্ষা দিয়েছি।
সবিতা : তাই নাকি? ব্যাপারটা খোলসা করে বলতো সন্ধ্যা ।
সন্ধ্যা : হুঁ বলছি । আজ বাসে একটু ভিড় ছিল , আমাদের সামনে একটা মাঝ বয়সী লোক, ওইতেরো চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ের গায়ে হাত দিচ্ছিল । আমি দেখে , যেই চন্দ্রাকে বলেছি ব্যাস , লোকটার আর কি পালানো পথ পায় ।

সবিতা : (উত্তেজিত ভাবে) তারপর কী হলো ?

সন্ধ্যা : তার পর আর কী ? আমাদের কথা শুনে বাসের যাত্রীরা লোকটাকে ধরে উত্তম মধ্যম প্রহার শুরু করে দিলো । তারপর পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেলাম । জানো কাকিমা লোকটার নামে অভিযো দায়ের করা হয়েছে , যৌন হেনস্থার । লোকটা এখন লকাপে ।

সবিতা : বাহ্, দারুন কাজ করেছিস তোরা। তোদের জন্য সত্যিই আমার খুব গর্ব হচ্ছে ।

অনির্বাণ : তবে, এতো বড়ো একটা কাজ করে তোদের কেমন লাগছে ?

চন্দ্রা : খুব ভালো লাগছে বাপি । তাইতো আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম, মা কেন এনজিওর কাজ করে এতো আনন্দ পায় । মা তো এমন কতো মেয়েদের জন্যই কাজ করে এনজিও তে । আমার খুব গর্ব হয় মাকে নিয়ে ।

অনির্বাণ : হুঁ , আমি ও ভাবছিলাম এনজিও তে জয়েন করবো । তখন আমাকে নিয়েও গর্ব করবি ।

নিশা : আর আপনার চাকরির কী হবে ?

অনির্বাণ : (হাসতে হাসতে উত্তর দিল) গত সপ্তাহে রিটিয়ার করেছি । তাই ও চিন্তা এখন নেই ।
নিশা : ও । জানো কাকিমা চন্দ্রা না তোমার মতোই হয়েছে । কোনো ভয়ডর নেই ।

চন্দ্রা : আরে আমার ইন্সপ্রিরেশান তো মা ।

অনির্বাণ :(চন্দ্রাকেউদ্দেশ্য করে) শুধু তোর না , আমার ও ।
নিশা : কাকাবাবু আপনি সত্যিই অন্যরকম । কাকিমাকে কতো সন্মান করেন । (হতাশার স্বরে) আমার বাবাকে কখনো দেখিনি এমনভাবে মার সঙ্গে কথা বলতে । আমার বাবা কাছে মেয়েদের কোনো সন্মান নেই ।
অনির্বাণ : দেখ মা, সবাই তো সমান নয় ,নারী পুরুষ দুজন দুজনকে সমানভাবে সন্মান করবে তবে না এতো দিনের বৈষম্য ঘুচবে । তবে এটুকু বলতে পারি সবিতা শুধু আমার স্ত্রী নয় , ও আমার সব চেয়ে কাছের বন্ধু , আমার আদর্শ । ওর প্রতিটা সিদ্ধান্তকে আমি সন্মান করি । ওর স্বামী হতে পেরে আমি গর্বিত ।

চন্দ্রা : আর আমি মেয়ে হতে পেরে ।
সবিতা :(মজার করার ভঙ্গিতে) আমি ধন্য হলাম। এই বাবা মেয়ে দুটোই এক । আচ্ছা , এবার নিশার কথা শুনি ।

নিশা : কাকিমা, আসলে বাবা- মা চাইছে আমার বিয়ে দিয়ে কাঁদ থেকে বোটাটা নামাতে । বলছে পড়াশোনা করে কী হবে ? এই নিয়ে প্রতিদিন আমাকে কথা শোনাচ্ছে । কালকে বাবা বলে দিয়েছে ,কলেজে আর যেতে দেবে না । আজ জোর করেই আমি কলেজে এসেছি , এখানে আসবো বলে ।

সন্ধ্যা : কাকিমা নিশার মধ্যে কোনো প্রতিবাদ নেই । সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে । আজ থানায় গিয়েও বলছে প্রতিবাদ করা নাকি ঝামেলায় জড়ানোর ।

(নিশা মাথা নিচু করে বসে আছে)

সবিতা : কে বলেছে প্রতিবাদ করতে জানে না ? আজকেই করেছে ।

নিশা : (অবাক হয়ে)আমি প্রতিবাদ করেছি ? কখন ?

সবিতা : এই যে, বাবা বারণ করা সত্তেও কলেজে গেলি । এটা প্রতিবাদ করা নয়?

অনির্বাণ : হ্যাঁ , তাইতো । সব সময় যে মুখে বলে প্রতিবাদ করা হয় তা নয় , কখনও কখনও ব্যবহারে বা আচরনের মধ্যে দিয়েও প্রতিবাদ করা যায় । আচ্ছা নিশা , তুই কি চাস ?

নিশা : কাকাবাবু , আমি নিজের পরিচিতি গড়তে চাই , আমি স্বনির্ভর হতে চাই , স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই ।

অনির্বাণ : তোর বাবা মাকে বলেছিস তোর ইচ্ছের কথা ?

নিশা : হ্যাঁ । কিন্তু কোনো লাভ হয়নি তাতে ।

সবিতা : লাভ ক্ষতির হিসাব কষা অত সহজ নয় নিশা । চুপ করে সব মেনে নেওয়া , কখনই সমস্যার সমাধান নয় । মনে রাখিস, জীবনটা তোর , তাই তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউই তোর জীবনের চালক হতে পারে না । তুই এখন সাবালিকা , তাই তোর ইচ্ছের ও দাম আছে , নিজের ভালো-মন্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে ।

নিশা : আসলে কাকিমা আমার বাবা মা, তোমাদের মতো নয় । ওঁরা বুঝবে না ।

চন্দ্রা : অনেকক্ষন ধরে আমি চুপচাপ শুধু শুনছি , কোন কথা বলিনি কিন্তু এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি । বুঝবে না মনে ? বুঝতে হবে । তুই যদি না পারিস তো আমরা বোঝাবো । কি সন্ধ্যা , তুই কী বলিস ?

সন্ধ্যা : অবশ্যই , এখন নারী সুরক্ষার জন্য অনেক আইন আছে । জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবো বললেই তো হলো না ।

অনির্বাণ : আমার সত্যিই এটা দেখে খুব ভালো লাগছে তোরা নিশাকে এতটা সাপোর্ট করছিস ।(নিশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে) নিশা , নদীর এক কূল ভাঙ্গে আর এক কূল গড়ে । তোর পাশে আজ তোর বাবা মা নেই তো কি হয়েছে , এমন দুজন বন্ধুকে পাশে পেয়েছিস ।যারা তোকে সাহস জোগাচ্ছে , বলেছে তুই একা নোস্ । অনেকের জীবনে এই সাপোর্ট ও থাকে না ।

সবিতা : হুঁ । (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) এই যেমন , তোর কাকাবাবু সাথে পরিচয় হওয়ার আগে পর্যন্ত , আমি কাউকে পাশে পায়নি । আমার বাবা মাও বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল ।

নিশা : তাই নাকি ?

চন্দ্রা: মা, তুমি তো আমায় এ বিষয়ে আগে কখনো কিছু বলো নি ।

সবিতা : (হতাশার স্বরে)কি বলবো বল ? আমারই তো বাবা মা , সেই সব কথা মনে পড়লে এখনো খারাপ লাগে । তবে আমার পড়াশোনা ওরা বন্ধ করতে পারেনি ।

নিশা : তাহলে তো, তোমাকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে এরজন্য ?
সবিতা : হ্যাঁরে। বাবা মা অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমাকে তো চিনিস , (হেসে হেসে উত্তর দিল) এঁটে উঠতে পারেনি ।

সন্ধ্যা : (আগ্রহের সাথে) কাকিমা , তারপর তুমি কী করলে ?

সবিতা : শোন তবে । আমাকে তো প্রথমে বাবা ভয় দেখালো , বললো - " আমি তোমার খরচ চালাতে পারবো না" আমি হেসেই উত্তর দিলাম , ওতো তুমি এখন ও চালাও না । উপরন্তু আমি টিউশনি করে যে কটা টাকা পাই তাতে নিজের খরচ চালানোর পরও মায়ের হাতে কিছু টাকা দিতে হয় । এই শুনে তো বাবা রেগে আগুন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো । আমাকে বললো " যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা । আমার মুখে মুখে তর্ক করছো ।তোমার ইচ্ছে মতো সব কিছু হবে না । আর যদি ভেবে থাকো যা খুশি তাই করবে , তবে এই বাড়িতে তোমার থাকা হবেনা । "

চন্দ্রা: এবার তুমি কী বললে মা?

সবিতা:এবার আমি একটু রেগেই গিয়েছিলাম আমার বাবার উপর । সোজা মুখের উপর উত্তর দিয়েছিলাম – ওতই সহজ , আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা, বলবে আর আমি বেরিয়ে যাবো । এই বাড়ি এখন ও আমার ঠাকুরদার নামে , তাই তোমার কোনো অধিকার নেই আমাকে বেড় করার । যেদিন বাড়ি তোমার নামে হবে ,সেদিন ভেবে দেখবো ।
তার আগে আমি এই বাড়ির থেকে এক পাও নড়ছি না ।

নিশা : (হাসতে হাসতে বলল) কাকিমা তুমি এভাবে নিজের বাবার সঙ্গে কথা বলছো ?

সবিতা : তবে নয় তো কি ? তোর কাকাবাবু তো কিছুক্ষন আগে বললেন আচরনের মধ্যে দিয়ে ওপ্রতিবাদ করা যায় । আমি তো তাই করেছি । বুঝিয়ে দিতে পেরেছি, তোমাদের মতো করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমি চলতে পারবো না ।

অনির্বাণ : আমাদের সম্পর্কের কথা যখন সবিতার বাবাকে বলতে গেলাম । তখন সবিতা যা বললো , আমি তো ভাবলাম হয়ে গেল , এবার না আমার ঘাড় ধরেই বাড়ি থেকে বের করে দেন ।

চন্দ্রা : কেন কী বলেছিলো মা ?

অনির্বাণ : শ্বশুরমশাই যখন বললো –"তোমাকে আমার পছন্দ নয় , এই বিয়ে হবে না । " সবিতা বলে বসলো , " বিয়েটা কি তুমি করবে বাবা? "অপর দিক থেকে একপ্রকার গর্জনের মতো করে উত্তর এলো 'মানে ?" ।

সন্ধ্যা : কাকিমা, এবার কী বললে ?

সবিতা:বললাম , মানেটা হলো গিয়ে , বিয়েটা আমি করবো , সংসারও আমি করবো , আর পছন্দ করার অধিকার শুধু তোমার একার ? আমার কথা শুনে বাবা হতভম্ব ।বাবা মন থেকে মেনে না নিলেও বাধ্য হয়েছিল বিয়েতে উপস্থিত থাকতে । কিরে নিশা আমার জীবনের গল্প তো শুনছিস মন দিয়ে , নিজে কী করবি ?

নিশা : তোমার মতো অত মনের জোর হয়তো এখনও আমার মধ্যে তৈরি হয়নি । তবে মুখ বুজে সব সিদ্ধান্ত মেনে নেবো না । কথা দিচ্ছি ।

সবিতা : শুধু কথা দিচ্ছি বললেই হবে না ।কাজেও করে দেখাতে হবে । সব মেয়েদের ভিতরেই আগুন থাকে, তবে কেউ প্রকাশ করতে পারে কেউ পারে না। তোর মধ্যেও আছে । নিজেকে সম্মান করতে শেখ , দেখবি প্রতিবাদ আপনা থেকেই আসবে ।

স্বীকার

সুপ্রিয়া বারুই

মঞ্চের মধ্যিখানে একজন মহিলা পিঁড়ি নিয়ে বসে।সামনে মাটির উনুন। বহুক্ষণ ধরে উনুনে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টায় রত।
(মহিলাটির ডানদিক থেকে একটি আট – নয় বছরের বালিকার প্রবেশ বিষন্ন মনে, মুখমণ্ডলে এক আকাশ মনখারাপের ছোঁয়া)

প্রথম অঙ্ক

মা : কীরে এর মধ্যেই চলে এলি যে! তুই না বললি এক সপ্তাহ মতন থাকবি!
খুকু : ভালো লাগছিল না মা ওখানে। তাই ....
মা : বুঝেছি। মায়ের জন্য মন কেমন করছিল তাই তো! পাগল মেয়ে আমার। তবে অন্য সময় রিপন দাদার বাড়ি যাব বলে লাফাস। তাই ভাবলাম পরীক্ষা শেষ যখন দুদিন থাকবি। তা না! এক রাত থাকতে না থাকতেই বাড়ি চলে এলো মেয়ে আমার।যদিও আমার মন খারাপ করছিল।
খুকু : কেন মা?
মা : বারে! তোকে ছাড়া কত থাকি আমি! ভাবছিলাম কালই একবার যাব ও বাড়ি...
(মায়ের মুখের কথা শেষ না হতেই)
খুকু : আমারও ভালো লাগছিল না মা তোমাকে ছাড়া থাকতে।(কাঁদো কাঁদো মুখ করে) আর খুব ভয়ও করছিল।
মা : ভয়! কীসের? কী হয়েছে? ওরা কি কেউ তোকে বকাবকি করেছে?(খুকু কোনো কথা বলে না। মহিলাটি উনুনে আগুন জ্বালিয়ে কড়াই বসায় ও তাতে জল ঢালতে ঢালতে বলে) কীরে বল! কী হয়েছে? তুই কি কিছু করেছিস?
(খুকু তাও উত্তর দেয় না। মা বকবে ভেবে ভীতগ্রস্ত হয়। কিছুক্ষণ পর...)
তার মানে নিশ্চয়ই কিছু করেছিস। দাঁড়া আমাকেই ও বাড়ি ফোন করে খবর নিতে হবে। তুই যখন কিছু বলবি না বলে ঠিক করেছিস...(রমাদেবী কড়াইতে মুঠো তিনেক ডাল চাপায় আর এদিক ওদিক নিজের মুঠোফোনখানি খুঁজতে তৎপর হয়)
মা : কোথায় যে গেল ফোনটা। কোথায় না কোথায় রাখি।কাজের সময় কিচ্ছু খুঁজে পাওয়া যায় না।
(খুকু এবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে...)
খুকু : না মা, তুমি ওখানে ফোন করবে না। কোনোদিনও করবে না। আমিও আর ও বাড়ি যাব না। তুমিও যাবে না। ওরা সব্বাই খুব পচা। খুউউউব্ পচা।
(মা অবাক হয়। মার মনে চিন্তা ও ভয় দুই-ই কাজ করে)
মা : কী হয়েছে রে মা? কিছু করেছে কেউ? আমাকে তুই বল মা। সব খুলে বল। ভয় পাস না।বল মা...
খুকু : রিপন দাদা খুব খারাপ মা... (খুকু আবার কাঁদতে থাকে হাউমাউ করে)

মা : কাঁদিস না। বস আগে। (পিছন থেকে একটা পিঁড়ি বাড়িয়ে দেয় রমাদেবী মেয়ের দিকে... মেয়েকে এক গ্লাস জল দেয়) নে জলটা খা আগে (মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দেয়) বল মা... কী করেছে রিপন দাদা?

খুকু : (মায়ের হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে ... জল খেয়ে) কাল দুপুরে রিপন দাদা বললো বর বউ খেলবে। আমি বললাম ঠিকাছে। তারপর ও অফিস গেল আর আমি রান্না করছিলাম...

মা : হুম্,তারপর?

খুকু : আমার রান্না শেষ হলো... ও অফিস থেকে ফিরে আসলো .... আমি ওকে খেতে দিলাম... তারপর... (খুকু নীরব। চোখের কোণে জল) তারপর রিপন দাদা আমাকে জড়িয়ে ধরল। ছাড়ছিলই না...

(উনুনের কাঠ শেষ হয়ে যাওয়ায় আগুন নিভে আসছিল। রমাদেবী আরও কয়েকটা কাঠ উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ... সঙ্গে দু – চারটে আমপাতা, নারকেল পাতাও)

খুকু : আমি কতবার বললাম আমার আর ভালো লাগছে না.... আমি খেলবো না...তাও রিপন দা আমাকে...

(মার চোখে জল। মেয়েকে কাছে টেনে নিল রমাদেবী)

মা : তাহলে বাড়ি চলে আসিসনি কেন কাল? জেঠুকে তো বলতে পারতি বাড়ি দিয়ে যেতে..

খুকু : বলেছিলাম মা।

মা : তাহলে?

খুকু : জানি না। বলল আজকে এসে আজকেই চলে যাবি! জেঠুর বাড়িতে একটাদিন থাকবি না! আজ থাক।কাল না হয় দিয়ে আসবো...

(উনুনের ডালটা একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে)

মা : হাত – মুখ ধুয়ে নে... তোকে খেতে দিই(কিছুক্ষণ পর) রাত্রে কি জেঠির সাথে শুয়েছিলি?

খুকু : হ্যাঁ.... জেঠু আর জেঠির মাঝে...

মা : তাহলে তো অনেক গল্প হয়েছে তিনজনের...

খুকু : না । জেঠি ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর জেঠু...

(সংকোচ বোধ করে) জেঠুও কেমন যেন...

মা : কেন? (ভীষণ ভয় নিয়ে ও গলার ঢোক গিলে)

খুকু : জেঠুও খারাপ। জেঠুও রিপন দাদার মতো বারবার আমাকে....

(মেয়ের মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে... মেয়েকে আরও বেশি কাছে টেনে নিয়ে...শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রমাদেবী)

মা : চুপ,চুপ। চুপ কর। আর ও বাড়ি যেতে হবে না কোনোদিন। আমি আর কোনোদিনও ওখানে পাঠাব না তোকে(মেয়েকে বুকে আগলে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে খুকুর মা)

উনুনের আগুন একসময় নিভে যায়। পোড়া ডালের গন্ধ ঘরময় হয়ে ওঠে।

(মা ও মেয়ে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(মঞ্চের মধ্যিখানে আলো।তিনটি মেয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে)

পপি : বারাসাত লোকালটা আজকে খুব লেট করল রে।

পম্পা : হ্যাঁ রে কলেজ যেতে খুবই দেরি হবে আজ।

পৌলমী : এ আর নতুন কী! রোজই লেট করে। কোনোদিন দেখলাম না টাইমে আসতে।

পপি : কাল থেকে এর আগের শেয়ালদা লোকালটা ধরতে হবে।

পম্পা : ঠিক কইসো পপি।

পৌলমী : হুমম... প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে। যাক গে, কোন স্টেশন ঢুকছে রে পম্পা?

পম্পা : কী জানি ! খেয়াল করলাম না তো!

পপি : তা কী করে করবি... গল্পে মশগুল যে! এই তো চাঁদপাড়া ঢুকছে রে পৌলমী

পৌলমী : আচ্ছা। এখনও পৌঁছতে দেরি আছে। আজও ফার্স্ট ক্লাসটা মিস হবে বুঝতেই পারছি।

পম্পা : সেই।

(ট্রেনটি থামায় একটি পনেরো - ষোলো বছরের মেয়ে তাড়াহুড়ো করে পিঠে একটা স্কুল ব্যাগ সহ মঞ্চের ডান দিক থেকে একেবারে বাঁ দিকে দৌড়ে চলে গেল। এবারে বাঁদিকে আরেকটি আলো)

পৌলমী : খালি ট্রেন। খামোখা এত দৌড়াদৌড়ি কেন বাপু!

পম্পা : সেই...

(তিনজনেই গল্পে মশগুল। বাঁদিক থেকে মেয়েটি ধীরে ধীরে মঞ্চের মধ্যিখানে আসে)

মেয়েটি : (সঙ্কোচ করে পৌলমীকে উদ্দেশ্য করে) আচ্ছা দিদি, এই ট্রেনটা কি শিয়ালদা যাবে?

পৌলমী : না... এটা তো বারাসাত লোকাল। বারাসাত পর্যন্ত যাবে।

মেয়েটি : ওও...আমি ভাবলাম শিয়ালদা যাবে। আমি আসলে এর আগে ট্রেনে খুব একটা চাপিনি। তাই আমি ঠিক বুঝি না। (কিছুক্ষন থেমে) আচ্ছা দিদি... শিয়ালদা কি অনেকটা দূর? মানে বারাসাত থেকে কি অনেকটা সময় লাগে?

পৌলমী : হ্যাঁ তা তো অনেকটাই। তাও প্রায় ঘন্টাখানেকের পথ।

পপি : হ্যাঁ ঐ রকমই লাগে।

পম্পা : (আগ্রহের সাথে) কেন? তুমি কোথায় যাবে?

মেয়েটি : আমি শিয়ালদা যাব। আমি তো আসলে ট্রেনের ব্যাপারটা অত বুঝি না। তাই... জিজ্ঞেস করলাম আর কী...

পৌলমী : কোনো ব্যাপার না। আমরা তো বারাসাত যাচ্ছি... তুমি আমাদের সাথে বারাসাত নামবে। আমরা সেখান থেকে তোমাকে শেয়ালদা লোকালে উঠিয়ে দেবো। চিন্তা কোরো না

(অল্পক্ষণ থেমে) কিন্তু তুমি কি একাই যাচ্ছ? না মানে... তোমার সাথে তো আর কাউকে দেখছি না... যদিও এটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার... তাও জিজ্ঞেস করলাম...

মেয়েটি : হ্যাঁ দিদি... আমি একাই যাচ্ছি...

পম্পা : আচ্ছা... তোমার নাম কী?

মেয়েটি : আমার নাম সুষমা... সুষমা ভক্ত। চাঁদপাড়ায় আমার বাড়ি।

পপি : হ্যাঁ, তোমাকে তো তখন দেখলাম চাঁদপাড়া স্টেশন থেকে উঠতে...

পৌলমী : আচ্ছা সুষমা... একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

সুষমা : হ্যাঁ দিদি বলো কী কথা...

পৌলমী : তুমি তখন বললে না যে... তুমি কখনো ট্রেনে যাওনি অথচ প্রথমবার একা একাই অতদূর যাচ্ছ যে...

সুষমা : না... মানে... প্রথমবার ঠিক না। এর আগেও কয়েকবার ট্রেনে গিয়েছিলাম... তবে সেটা আমার বাড়ির লোকের সাথে। আজকে এই ফার্স্ট টাইম একাই ট্রেনে উঠলাম।

(তিন বান্ধবী তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। নিজেদের মধ্যে সন্দেহের ইশারা চলে)

পম্পা : (কিছুক্ষণ পর) আচ্ছা তুমি কীসে পড়ো? আই মিন... কোন ক্লাসে?

সুষমা : আমি এবার মাধ্যমিক পাস করে ক্লাস ইলেভেনে উঠেছি দিদি।

পৌলমী : আচ্ছা সুষমা... আমাকে একটা কথা বল তো... তুমি একা একা অতদূর যাচ্ছ... রাস্তাঘাট কিছুই চেনো না... অথচ তোমার সাথে তোমার পরিবারেরও কেউ নেই... ব্যাপারটা কী?

(সুষমা নিশ্চুপ। কোনো উত্তর না আসায় কিছুক্ষণ পর)

না মানে... তুমি তো অনেক ছোটো। এতদূর যাচ্ছ! তাও আবার শেয়ালদার মতন জায়গায়। তুমি তো হারিয়েও যেতে পারো... তাই না!... নাকি তোমাকে কেউ নিতে আসবে?

পপি : হ্যাঁ তোমাকে কি কেউ এর মাঝে রিসিভ করতে আসবে?

পম্পা : হ্যাঁ বলতেই পারো আমাদের। আমরা তো তোমার দিদির মতন হই। তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আমাদের চিন্তা হচ্ছে। তাই জিজ্ঞেস করছি এতকিছু। বলো... আমরা যদি তোমায় কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি!

সুষমা : আসলে... (কপালের ঘাম মুছে) আসলে আমি বাড়ির থেকে পালিয়ে এসেছি...

(তিনজনেই একসাথে)

পপি : কী?

পম্পা : কী?

পৌলমী : কী!

(পুনরায় তিন বান্ধবী পরস্পরের দিকে তাকায় আবার কিছুক্ষন নিজেদের মধ্যে ইশারা চালায়)

পৌলমী : তুমি বাড়ির থেকে পালিয়ে অতদূর যাচ্ছ!

সুষমা : হ্যাঁ (কিছুটা সংকোচ বোধ করে) আমি... ইয়ে... মানে... আমি আসলে একজনকে ভালোবাসি... সে আমার জন্য শিয়ালদায় অপেক্ষা করছে। তাই আমি...

পম্পা : মানেটা কী? কতটুকুই বা বয়স তোমার... যে... তুমি ভালোবাসো কাউকে আবার তার জন্য এতদূরে যাচ্ছ... যেখানে তুমি কিছুই চেনো না... এমন অপরিচিত একটা জায়গায় যাচ্ছ তুমি... তোমার ভয় করছে না! আমিই তো তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

সুষমা : (বিনয়ের সাথে) হ্যাঁ ভয় তো করছে।

পপি : তাহলে?

পৌলমী : যাকে ভালোবাসো সে কোথায়?

সুষমা : সে শিয়ালদায় আছে... আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

পপি : তা সে তোমাকে নিতে আসেনি কেন?

সুষমা : ওর তো অনেক কাজ... ওর অনেক ব্যবসা রয়েছে... আর ওর বাড়িও অনেক দূর.. তাই আর কী...

পৌলমী : কীভাবে বোকা বানাচ্ছে (নিজেকে) তা ওর বাড়ি কোথায়?

সুষমা : সুন্দরবনে।

পৌলমী : এক মিনিট... ওখানকার ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কীভাবে?

সুষমা : ফেসবুকে।

পম্পা : এবার বুঝেছি ব্যাপারটা।

পপি : হুম্ বুঝলুম!

(পপি ও পম্পা দুজনে মুখে হাত দিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে)

পৌলমী : (বান্ধবীদের হালকা ধমক দিয়ে) হাসিস না তো... যথেষ্ট সিরিয়াস একটা ব্যাপার। আমাদের ওর পাশে থাকা উচিত। ওকে বোঝানো উচিত। (সুষমাকে উদ্দেশ্য করে) কত দিনের আলাপ তোমাদের?

সুষমা : এই দেড় মাস মতন।

পম্পা : (কপালে হাত ঠেকিয়ে) আর এই দেড় মাসের আলাপে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসলে!

সুষমা : আসলে দিদি আমার বাড়ির লোকেরা খুব ডেঞ্জারাস। ওরা কিছুতেই আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবে না কোনদিন। তাই আমি বাধ্য হয়ে...

পৌলমী : আর তাই বলে! (নিজেকে সামলে নিয়ে) যাক গে... তুমি তাকে কখনো সামনাসামনি দেখেছো?

সুষমা : না দিদি... সামনাসামনি আমাদের কখনো দেখা হয়নি। তবে ছবিতে দেখেছি ও আমাকে ওর ছবি পাঠিয়েছিল আর কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে আমাদের।

পপি : আর তাতেই...

পম্পা : আর তাতেই তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসলে! বাহ... এত বিশ্বাস!! কই দেখাও তো ছেলেটির ছবি...
(সাথে থাকা ব্যাগ থেকে মেয়েটি একটা স্মার্টফোন বার করে ও ছবি দেখাতে প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত করে)
পপি : আরে দেখাও দেখাও আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না।
সুষমা : (ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি খুলে) এই যে দিদি... এটা ওর ফেসবুক প্রোফাইল..
(তিনজনেই একসাথে)
পৌলমী : দেখি
পপি : দেখি
পম্পা : দেখি
(তিন বান্ধবী আবার তিনজনের দিকে চোখাচোখি করে নিয়ে)
পম্পা : আরে এটা তো ফেক প্রোফাইল।
পপি : একদম এটা তো ফেক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
পৌলমী : তুমি বোকামি করছ বোন। ও তো তোমাকে পুরোই ঠকাচ্ছে। ছবিতে যাকে দেখছ সে তো আসল লোক নয়।
সুষমা : (অবাক হয়ে ও অবিশ্বাসের সাথে) না... এ হতে পারে না... তোমরা মিথ্যে বলছো। ও আমাকে বলেছে এটা ওরই ছবি... এটাই ও...
আর তাছাড়া... তোমরা কী করে বুঝলে এটা ওর আসল ছবি নয়! তোমরাও তো ওকে সামনাসামনি দেখোনি... তাহলে কীসের ভিত্তিতে বলছো?
(তিনজনেই প্রায় একসাথে)
পৌলমী : অভিজ্ঞতা দিয়ে রে বোন।
পপি : একদম।
পম্পা : একেবারেই।
পৌলমী : এটা ফেক অ্যাকাউন্ট। তুমি ছোটো তাই বুঝতে পারছ না। দেখো ভালো করে। প্রোফাইলে খুব বেশি ছবি নেই আর যে কটা ছবি আছে সবই কেমন হেজি হেজি আর এগুলো দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে... এটা কোথাও থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া ছবি।
(সুষমাকে কাঁদতে দেখে) তাছাড়া তোমার এখন বয়সই বা কত... এই বয়সে তুমি ফেসবুক করছ... আবার সেখান থেকে প্রেম করে বাড়িও ছেড়ে চলে আসছো...
পম্পা : তাছাড়া তোমার কোনো আইডিয়া আছে এখন কত রকম স্ক্যাম্প হয়... জানো কত ছোটো ছোটো মেয়েদের ভুলভাল বুঝিয়ে গ্রাম থেকে বের করে কত দূরে দূরে নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হয়... পাচার করা হয়।
পপি : একদমই তাই। আবার নানারকম কথা বলে তাদেরকে সম্পর্কের জালে ফেলা হয়... কত রকম ভাবে বোকা বানানো যায়... জানো তা...! হতে পারে এটাও সেরকমই একটা র‍্যাকেট।

(কিছুক্ষণ থেমে সুষমার দিকে তাকিয়ে) তাছাড়া মাত্র দেড় মাসের আলাপ তোমাদের... কখনো সামনাসামনিও দেখনি... তাকে ভরসা করে... তার ওপর বিশ্বাস করে... তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসলে! এতে তোমার বাড়ির লোক কতটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে জানো! হয়তো এতক্ষণে তারা সবাই তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে...

পম্পা : হয়তো কী.... নিশ্চয়ই করছে। তোমার মা নিশ্চয়ই কত কান্নাকাটি করছে। তাছাড়া দেড় মাসের সম্পর্ক। মাত্র দেড় মাস... মানুষ বছরের পর বছর একটা সম্পর্কে থাকার পরেও তাকে সম্পূর্ণ চিনে উঠতে পারে না আর সেখানে তো...

সুষমা : (কাঁদতে কাঁদতে) কিন্তু ও যে আমায় খুব ভালোবাসে বলেছে... ও বলেছে... ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না... আমিও তো...

(তিন বান্ধবীর মুখেই এবারে ব্যঙ্গ হাসি)

পপি : (হাসতে হাসতে) এসব সব কথার কথা। এরকম কিছুই হয় না।

পম্পা : এরকম কথা কতজনকেই না দিয়েছে তার ঠিক নেই...

পৌলমী : তোরা থামবি এবার...(সুষমার দিকে তাকিয়ে) এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। আর যদি ধরেও নিই... ও তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে তাহলে কি কখনো তোমাকে বাড়ি থেকে পালানোই মদত দিত! তাও তুমি এতটুকু একটা মেয়ে... কখনো বলত পড়াশোনা ছেড়ে, নিজের পরিবারকে ছেড়ে এভাবে চলে আসার কথা...! ভালোবাসা এরকম হয় না গো বোন।

সুষমা : (কাঁদো কাঁদো সুরে) না না... ও আমাকে পড়াশোনা করাবে বলেছে।

পপি : সে তো বুঝলাম। এটা বলো আমাকে... ও তোমাকে একা একা আসতে বলল কেন এতটা রাস্তা? তেমনই হলে তো ও নিজেই তোমাকে চাঁদপাড়াতে নিতে আসতো তাই না?

পম্পা : হ্যাঁ সেই, তুমি এতটুকু বাচ্চা একটা মেয়ে... সে যদি সত্যিই ভালো হতো তবে কিন্তু ও তোমাদের গ্রামে যেত, তোমার বাড়ি যেত, তা কিন্তু করলো না... ও কিন্তু নিজেকে সেফ রাখল... পাছে ও যাতে কোনও বিপদে না পড়ে তাই তোমাকে শিয়ালদা অবধি যেতে বলল... সেটাও ভেবে দেখো...

পপি : একেবারেই। তুমি যে বাড়ি ছেড়ে চলে এলে... তোমার তো সাত পাঁচ সব ভাবা উচিত ছিল। বড় হয়েছো। এগুলো তো নিজেকে বুঝতে হবে... তাই না? নিজের ভালো তো নিজেকেই ভাবতে হবে। আবেগে ভেসে গেলে তো আর চলবে না।

(সুষমার কান্না থামে। এবারে ভাবতে থাকে)

পৌলমী : সর্বোপরি তোমার বয়ফ্রেন্ড যদি সত্যি তোমায় ভালোবাসতো... তাহলে এত ছোটো বয়সে তোমাকে বিয়ে করা বা বাড়ি ছেড়ে চলে আসার কথা, কখনোই বলতো না। উপরন্ত তুমি কোনো ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিলে তোমাকে বকবে, বোঝাবে। ভালোবাসা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না... আর ভালোবাসার মানুষটিও সঠিক হলে সেও তো পালিয়ে যাবে না। সে তোমার ভালো চাইলে তোমাকে সবসময় মোটিভেট করবে, বোঝাবে এবং তোমার কেরিয়ারে তোমাকে এগিয়ে যেতে সবসময় সহায়তা করবে। তোমার পাশে থাকবে। (কিছুক্ষণ থেমে) বুঝলে?

(সুষমা চোখের জল মোছে। বুঝতে পারে কথাগুলো)

সুষমা : ঠিক বলেছ দিদি তোমরা। তোমরা আমার অনেক বড় উপকার করলে। আমি একটা ভীষণ বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম। তোমরা আমাকে বাঁচালে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।

তিনজনেই একসাথে --- এটা তো আমাদের কর্তব্য রে।

কথা বলতে বলতে ট্রেন বারাসাত স্টেশনে এসে থামে এবং চারজনেই আপের ট্রেন বনগাঁ লোকাল ধরে।

(মঞ্চ থেকে চারজনেই প্রস্থান করে)

তৃতীয় অঙ্ক

মঞ্চের মধ্যিখানে একজন মহিলা হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। পরনে শাড়ি।

মঞ্চের ডান দিক থেকে একটা পদশব্দ শুনে গোপনে কান্না বন্ধ হয়ে যায় মহিলাটির। দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নেয় এবং মুখে একটা মিথ্যে হাসি ফুটে ওঠে।

সবিতা : ও বৌদি তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তখন থেকে ডাকছি তোমায়... শুনতে পাওনি?(ছোট্টখাট্টো রোগা – সোগা মেয়ে সবিতা। দেখতে ঠিক যতটা ছোট, কাজে ঠিক ততটাই বড়ো। একাই নিজের সংসার সামলে আরও দশ বাড়ির কাজ করে

সাগরিকা : (অন্যমনস্কভাবে) কই না তো... কখন এলি?

সবিতা : এই তো... এলাম সবে। দাও দিকি... বাসনগুলো তাড়াতাড়ি দাও। এগুলো মেজে আবার দত্তবাড়ি যেতে হবে। ও বাড়ির ঠাম্মা যা রাগী... জানোই তো... একটু দেরি হয়েছে কি হয়নি... গুষ্টি ধরে গাল পারতে আরম্ভ করে। এই... তোমার এখানেই যা একটু শান্তি পাই... বাবাহ্... দাও তাড়াতাড়ি কী কাজ আছে...

সাগরিকা : তুই বড্ড বেশি বকিস পঞ্চুর মা। এত এক্সট্রা বকতে ভালো লাগে তোর ...! (কিছু এঁটো বাসন বার করে দেয়)

সবিতা : তা ঠিক বলেছ! আমি একটু বেশিই বকি। তা... তোমার আবার কী হলো আজ দিদি? মন খারাপ নাকি?

সাগরিকা : (বিষণ্ন ভাবে) আমার আবার কী হবে? কিছুই হয়নি। আমাকে না দেখে কাজগুলো দেখ। কত কাজ দেখেছিস... তাড়াতাড়ি কর... আমি তোর জন্য ভাত বাড়ছি। তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে আয়... দুটো খেয়ে নে... (হাড়ি থেকে ভাত নিয়ে থালায় বাড়তে থাকে)

সবিতা : একমাত্র তুমি আমার খেয়াল রাখো গো সাগরিদি... আর কেউ না গো.. সত্যি বলছি। আর কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে না... আমি কেমন আছি... কি করছি... না করছি... খেয়েছি কি না... কিছুই না.... (চোখের কোণায় আসা জল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে)

কলপাড়ে বাসন মাজতে থাকে সবিতা।

সাগরিকা : কেন তোর ছেলেরা আছে তো!

সবিতা : ধুর! বাদ দাও তো ওদের কথা!... তোমার একটা মেয়ে আছে তুমি বেঁচেছ। আমারও যদি একটা থাকতো গো...

সাগরিকা : আর তোর বর!

সবিতা : ও মিনসে থাকাও যা... না থাকাও তাই। কেন যে ওরে বিয়ে করেছিলাম... আল্লাই জানে (উপরের দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে খানিক পরেই বলে) তা তুমি আজ হঠাৎ আমার বর - বাচ্চার খবর নিচ্ছে যে বড়ো ...!

সাগরিকা : এমনি... কেন জিজ্ঞেস করতে পারি না?

সবিতা : আলবাত পারো। একশো বার পারো। তা বৌদি... বললে না তো কী হয়েছে তোমার... দাদাবাবু কি কিছু বলেছে..?

সাগরিকা : তেমন কিছু না...(কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কাঁদো কাঁদো আহ্লাদের সুরে) তুই তো জানিস... একাদশীর দিন আমি উপোস করি। তাই আন্দাজে আন্দাজে রান্না করায় শাকে নুন একটু বেশি পড়ে গেছে বোধহয় আজ। তা নিয়ে তোর দাদাবাবু পুরো বাড়ি একেবারে মাথায় করে তুলল... অথচ এটা দেখল না একবারও... সারাদিন আমি না খেয়ে আছি...উপোস থেকে রান্না করেছি...একটাবারও জিজ্ঞেস করল না পর্যন্ত আমি কিছু খেয়েছি কিনা। জানিস...

সবিতা : আ মলো যা! এই ব্যাপার..! (হাসতে হাসতে) আমি ভাবলাম কী না কী... দাদাবাবু তো অনেক ভালো গো...শুধু একটু চেঁচিয়েছে তোমার উপর... আর তাতেই তোমার মুখ ভার...। আমার জন কী করেছিল জানো? (কাজ থামিয়ে)

সাগরিকা : (অবাক গলায়) কী ?

সবিতা : চায়ে চিনি একটু কম হওয়ায় গরম চা একবার আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে মেরেছিল।

সাগরিকা : (বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে) কী এত সাংঘাতিক ব্যাপার!

সবিতা : এ তো কিছুই না...(অভ্যস্ত গলায়) এসব তো রোজকার ব্যাপার। পরশুদিনই তো কাজ থেকে বাড়ি এসে পয়সার হিসেব না মেলাতে পেরে আমার উপর সব রাগ দেখালো... উঠোন থেকে চ্যালা কাঠটা নিয়ে আমায় কী মার মারলো গো বৌদি...(কাঁদতে কাঁদতে) এখনও আমার হাড়গোড় সব ব্যথা গো...এই দেখো (কাঁধের থেকে ব্লাউজটা একটুখানি নামিয়ে কাঁচা ঘা দেখায়) এরকম সারা শরীরে আরও আছে...

সাগরিকা : (ঘা দেখে আঁতকে উঠে) এত কিছুর পরেও তুই কাজ করছিস! তোর কী লোহার শরীর এটা!

সবিতা : (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ গো দিদি, ঠিকই বলেছ। শরীরটা এখন লোহাই হয়ে গিয়েছে। (কিছুক্ষণ পর) কাজ না করলে সংসার চলবে কী করে বলো? ওর তো রোজের কাজ না। দুদিন কাজ করে... তো দশ দিন বসে থাকে। বড়ো ছেলেটা রোজ আমার থেকে একশো করে টাকা নিয়ে তবে কলেজে যায়... আর ছোটোটা এবার ক্লাস নাইনে উঠলো। কত খরচ পড়াশোনার... বোঝোই তো... (একটু হেসে) তাছাড়া এসব এখন সহ্য হয়ে গেছে গো দিদি...

আবার বাসন মাজতে শুরু করে সবিতা।

সাগরিকা : তুই এর প্রতিবাদ করিস না কেন? এখন তো কত আইন বেরিয়েছে... হাজারটা কেস ঠোকা যাবে ওর নামে। থানায় গিয়ে দু ঘা খেলেই পুরো সিধা... তাহলে কেন বেকার সব মুখ বুজে সহ্য করিস..!

সবিতা : কী দরকার বৌদি ওসব উটকো ঝামেলার... তাছাড়া যাই করুক না কেন ও তো আমার সোয়ামী হয় (ঈষৎ হেসে) আর কথায় আছে না... উপরের দিকে থুতু ছিটালে তা নিজের মুখেই এসে পড়বে.... ফালতু দুদিনের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি রটবে...

সাগরিকা : তাই বলে সব সহ্য করে নিবি! কিছু বলবি না!!

সবিতা : সহ্য করছি গো দিদি... বাইশটা বছর ধরে সহ্যই করে যাচ্ছি শুধু ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে। নইলে কবেই তো সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে...(বাসন মাজা শেষ করে) নাও গো বৌদি কমপিলিট্।

সাগরিকা : আয়, এবার খেয়ে নে... ভাতটা জুড়িয়ে গেল একেবারে।

সবিতার মতো কত নারীই যে শুধু সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সব অত্যাচার সহ্য করে নিয়ে টিকে থাকে সংসারে কোনরকমে।

(উভয়েই মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে)

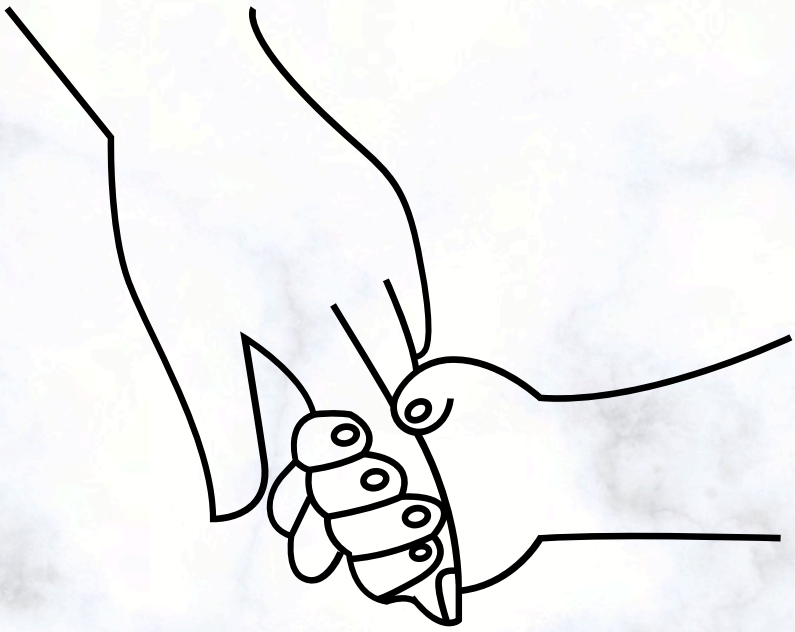

সাতরঙা

ঐন্দ্রিলা বসু

(সাজানো-গোছানো এক ড্রয়িং রুম। মঞ্চের মাঝখানে একটি সোফা। সামনে একটি ছোট কাঠের টেবিল। টেবিলের উপরে ফুলদানি ও কয়েকটি কাগজ এবং ম্যাগাজিন রাখা। ঘরের দেয়ালে একটি বড়ো রামধনুর ছবি টাঙানো। মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা ছোটোখাটো খেলনা পড়ে আছে দু একটা পুতুল, খেলনা গাড়ি, রান্নাবাটি ইত্যাদি।
শাড়ি পরনে একটি মেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। কোমরে আঁচল গোঁজা। এলোমেলো অবিন্যস্ত খোঁপা ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে। কপালে স্বেদবিন্দু, কিন্তু মুখে আনন্দের দ্বাপ স্পষ্ট। তার নাম ঐশিকা।)

ঐশিকা (কপালের ঘাম মুছতে মুছতে)। উফফ, কত বেলা হয়ে গেলো, রান্না এখনো সারা হলো না। কতদিক যে সাপটাবো একা হাতে। মেয়েটাকেও চান করানো হয়নি। ঘর-দোর কিচ্ছু ঝাট পড়েনি। একদিন কাজের দিদি কামাই করলো কি ব্যাস। সব কাজ আমার ঘাড়ে। দাদারাও তো এসে পড়লো বলে। ধুর ধুর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার।

(হঠাৎ ছড়িয়ে রাখা একটা খেলনার সাথে পায়ে ঠোকর খেয়ে)

আর এই মেয়েটাও না। সব খেলনা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কী অবস্থা করে রেখেছে ঘরটার। আদরে আদরে বাঁদর তৈরী হয়েছে একটা। (বলে চেচিয়ে) বুবুই-ই-ই, অ্যাই বুবুই-ই-ই।

(সাথে সাথে একটি আট-নয় বছরের মেয়ের প্রবেশ, পরনে ঢুক)

বুবুই কী হয়েছে মাম্মাম? আমায় ডাকছো কেন?
ঐশিকা কী অবস্থা করে রেখেছিস ঘরটার দ্যাখ তো। কতবার বলেছি বুবুই একটু গুছিয়ে রাখবে নিজের জিনিসপত্র। তোমার মাম্মাম একা একা এতো কিছু করতে পারে বলো?। কষ্ট হয় না?
বুবুই। একা একা করছো কেন মাম্মাম? মাপাকে ডাকো, হেল্প করে দেবে।
ঐশিকা (ঝুঁকে খেলনাগুলো তুলতে তুলতে)। তোর মাপা এ জগতে থাকলে তো! কোথায় যে উড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি! সেই কখন একটু দই-মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছি। সংসারের কাজে আসবেন সে জো আছে ওনার!
বুবুই (বিস্মিত হয়ে) মাপা এ জগৎ থেকে উড়ে গেছে!? কোথায়? স্যাটার্নে? এই আমিও যাবো। তারপর ঐ রিংটায় আমি আর মাপা ধরাধরি খেলবো। (হাততালি দিয়ে) কী মজা! (তারপর ঐশিকার হাত ধরে) চলো না মাম্মাম আমায় স্যাটার্নে নিয়ে চলো না মাপার কাছে।
ঐশিকা ওফফ বুবুই। খালি বাজে কথা। একে চারদিক সামলাতে আমায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে, তুমি আর এর মধ্যে আমার মাথা খেয়ো না তো।
বুবুই (ঈষৎ মনক্ষুন্ন হয়ে)। আচ্ছা বাপু ঠিক আছে, অত ঘাম ফেলতে হবেনা। আমি হেল্প করছি তোমায় গোছাতে।
ঐশিকা (বুবুইয়ের নাক টিপে)। "আচ্ছা বাপু"?। পাকা বুড়ি একটা। তোমায় কিছু করতে হবেনা, যাও, ঘরে গিয়ে নিজের হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করে নাও।

বুবুই ধুর আজও পড়াশোনা করতে হবে? ভাল্লাগেনা... (বলে পিছন ফিরে ধীর পদক্ষেপে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। ফের ঐশিকার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে) আচ্ছা মাম্মাম, মামা কখন আসবে?

ঐশিকা (খেলনাগুলো তুলে একপাশে রেখে)। চলে আসবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। তার আগে তুমি পড়াশোনাটা শেষ করে নাও যাও। আজ স্কুল কামাই হলো, কাল যেন...

(তখনি কলিংবেলের শব্দ)

ঐশিকা (স্বগতোক্তি)। এই রে, দাদারা কি এখনই এসে পড়লো নাকি? (কপালে হাত দিয়ে) এখনো ভাত চড়ানো হয়নি। ঘর দোরের এই অবস্থা। ধুর। দিব্যা-টা একবার বাড়ি ফিরুক আজ...। (বলতে বলতে দ্রুত পায়ে স্টেজের বামদিকে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি খোলার ভঙ্গি করে)

(ঘরে ঢুকে আসে একটি মেয়ে। পরনে জিন্স ও ফুল স্লিভ শার্ট। হাতে মিষ্টির হাঁড়ি। এর নাম দিব্যা।)

দিব্যা সরি ঐশিকা, একটু দেরি হয়ে গেলো। এনে ধর।

(দিব্যা ঐশিকার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে দিয়ে স্টেজের কোনে গিয়ে জুতো খোলে।)

ঐশিকা (হাঁড়িটা টেবিলে নামিয়ে রেখে রণচন্ডী মূর্তি ধারণ করে)। "একটু দেরি"। সকাল দশটায় বেরিয়ে এখন সাড়ে বারোটায় বাড়ি ঢুকছিস। "একটু দেরি" এটা?! দই পাতানো দেখছিলি নাকি ময়রার থেকে মিষ্টি বানানো শিখছিলিস?।

(দিব্যা দ্রুত পদক্ষেপে ঐশিকাকে পাশ কাটিয়ে বুবুইয়ের পিছনে গিয়ে তার কানে ফিসিফিসিয়ে বলে)

দিব্যা হ্যাঁ রে বুবুই, তোর মাম্মাম তো খুব রেগে গেছে রে।

বুবুই (দিব্যার কানে কানে)। তা রাগ করবে না মাপা? তোমার জন্য কখন থেকে ওয়েট করছে। মামা-মামিও তো এসে যাবে।

দিব্যা (বুবুইয়ের চুল ঘেঁটে দিয়ে)। খুব তো মায়ের হয়ে কথা বলছিস; আমার হয়েও একটু কথা বল নাহলে যে চকোলেটটা এনেছি ওটা তাহলে আমার পেটেই যাবে কিন্তু।

বুবুই এই না না, আমার চকোলেট চাই। (ঐশিকার দিকে আঙ্গুল উচিয়ে) অ্যাই মাম্মাম, আমার মাপাকে একদম বকবেনা।

ঐশিকা তুই ঐটুকু বাচ্ছাকে ঘুষ দিচ্ছিস দিব্যা? তোর জন্যই বিগড়াচ্ছে বুবুই। (বুবুইয়ের দিকে ফিরে) আর বুবুই এক্ষুনি ঘরে যাও, মামারা আসার আগে যেন maths এর exercise গুলো কমপ্লিট হয়ে যায়।

বুবুই (কাঁচুমাচু স্বরে)। মাম্মাম প্লিজ আজ ভাল্লাগছে না পড়তে। আজ মামা আর মামি আসবে। আমার খুব এক্সাইটেড লাগছে। মন বসছেই না পড়ায়।

দিব্যা এক্সাইটেড লাগাটাই স্বাভাবিক। জন্মে থেকে আজ প্রথম দেখছিস। এই ন' বছরের মধ্যে তো তোর মামার সময়ই হয়নি এসে তোর মাকে আর তোকে দেখে যাওয়ার। আমার কথা ছেড়েই দিলাম।

বুবুই কেন মাপা? মামা বুঝি খুব ব্যস্ত থাকে?
ঐশিকা (গম্ভীর স্বরে)। দিব্যা ঐটুকু বাচ্ছার সামনে কি এসব কথা না বললেই নয়?
দিব্যা আর কতদিন লুকিয়ে রাখবি? বড়ো তো হচ্ছে ও, ওর-ও তো জানা দরকার সবকিছু।
ঐশিকা যখন জানার ঠিক জানবে (বুবুইয়ের উদ্দেশ্যে) বুবুই তুমি ঘরে যাও। পড়তে বসো বা নিজের মতো খেলো, যাও।
বুবুই আচ্ছা, (দিব্যার দিকে ফিরে) মাপা আমার চকোলেটটা দিয়ে দাও, আমি ঘরে যাই। তারপর তোমরা দুই বন্ধু মন ভরে ঝগড়া কোরো নিজেদের মধ্যে।
দিব্যা (বিস্মিত হয়ে)। "বন্ধু"। এই, আমি তোর মাম্মামের বন্ধু নই হ্যাঁ? (আরও কিছু বলতে গিয়েও ঐশিকার ইশারায় চুপ করে যায়। জিন্সের পকেট থেকে চকোলেট বের করে বুবুইয়ের হাতে দিয়ে দেয়। বুবুই চলে যায়।)
ঐশিকা তোর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। মেয়েটা সবে নয়ে পড়লো, এর মধ্যেই ওর মাথায় এসব জটিলতা না ঢোকালেই নয়?
দিব্যা এক সেকেন্ড...এক সেকেন্ড। কিসের জটিলতা? আমি তো তোর কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। কেন জানবেনা বুবুই যে আমার আর তোর মাঝের সম্পর্কটা ঠিক কী?
ঐশিকা ছেলেমানুষি করিস না দিব্যা। আপাতত মেয়েটা না হয় আমাকে আর তোকে বন্ধু হিসাবেই জানুক। বন্ধুত্ব তো সব সম্পর্কেই থাকে, আমাদের সম্পর্কে কি তা নেই?
দিব্যা কিন্তু দুজন বন্ধুর সম্পর্ক আর আমাদের সম্পর্কটা তো আলাদা। সেটা ওকে এখন না বললে কবে বলবি? এই সমাজের মধ্যে বড়ো হতে হতে ওর পুরোপুরি brainwash হয়ে যাওয়ার পর?
ঐশিকা তুই অযথা রাগ করছিস। এখন ওকে এসব বললে ও বুঝবে না। ও চারদিকে দেখেছে, ওর বন্ধু-বান্ধবীদের সবার একজন মাম্মাম আছে আর একজন পাপা আছে। এখন ওর ক্ষেত্রে কেন তার জায়গায় একজন মাম্মাম আর একজন মাপা আছে সেটা বোঝার জন্য তো ওকে এনাফ ম্যাচিওর হতে হবে।
দিব্যা রিয়েলি? আমি তো জানতাম মাটি নরম থাকতে থাকতেই গড়তে হয়। বাট তোর তো আলাদাই লজিক! (বিরক্ত হয়ে পায়চারি করতে থাকে)
ঐশিকা শোন দিব্যা, আমাকে শুধু শুধু কথা শোনাবিনা। আজ দাদারা আসছে, আমি তোর সাথে অযথা ঝগড়া করে মন খারাপ করে থাকতে চাই না। (একটু চুপ করে থেকে) আমি কফি করে নিয়ে আসছি তোর জন্য।

[প্রস্থান]

(দিব্যা পায়চারি থামিয়ে সোফায় বসে। টেবিল থেকে খবর কাগজ তুলে গড়তে শুরু করে। এক দু পাতা ধীরে ধীরে পড়ার পর তৃতীয় পাতায় চোখ আটকে যায়। কাগজটাকে ভাঁজ করে সেই পাতায় মনোনিবেশ করে। কিছুক্ষণ পড়ার পর বিস্মিত স্বরে স্বগতোক্তি)

দিব্যা এ আমি ঠিক দেখছি।? বেঙ্গালুরুতে সমপ্রেমের অপরাধে এক যুবককে তার মা সংশোধনী ধর্ষণ করেছে। হা ভগবান! এরা কি পাগল হয়ে গেছে!?
(চায়ের কাপ-প্লেট হাতে ঐশিকার প্রবেশ। সে টেবিলে সেটা নামিয়ে রাখে।)

ঐশিকা কী হয়েছে রে? তোকে এরকম হতভম্ব লাগছে কেন?

(দিব্যা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খবরের কাগজটা ঐশিকার হাতে তুলে দেয়। তারপর চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয় ও চুমুক দিতে থাকে। ঐশিকা খবরের কাগজে দৃষ্টি বোলাতে থাকে; তার মুখের রেখার পরিবর্তন হতে থাকে। খানিক পর পড়ার ভঙ্গিতে বলে,

ঐশিকা "... এরপর ছেলে বিগত চার বছর ধরে তার পুরুষ বন্ধুর সাথে সম্পর্কে রয়েছে জানতে পেরে চরম পদক্ষেপ নেন মা। ছেলেকে তাঁর সাথে জোর করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করেন। পরে ছেলেটি খানায় মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি এই বলে ব্যাখ্যা দেন যে সেটি সংশোধনী ধর্ষণ বা corrective rape ছিলো, যা তিনি ছেলের মঙ্গলের জন্যই চেয়েছিলেন যাতে সে সমকামিতার অসুখ থেকে মুক্তি পায়।"!

(পড়া শেষে ঐশিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে দিব্যার দিকে তাকায়।)

ঐশিকা এসব কী।

দিব্যা (চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে)। ভেবে দ্যাখ তাহলে, বুবুই এই সমাজে কখনো সুস্থভাবে বড়ো হতে পারবে যদি আমরা ওর ধারণাগুলো ছোটবেলা থেকে স্বচ্ছ করে গড়ে না তুলি? এখন থেকে ওকে না সচেতন করলে হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন ও আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে সমাজের সামনে। ওর মাম্মাম আর মাপা হয়ে সেদিনটা দেখতে পারবো তো আমরা?!

ঐশিকা আমি জানিনা আমার কী করা উচিত। এমন এক সমাজে বাস করি আমরা যেখানে "সমপ্রেম" শব্দটা গলা নিচু করে উচ্চারণ করতে হয়, "গে", "লেসবিয়ান" টার্মগুলো গালাগাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, বিষমকামিতা বাদে যেকোনো সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনকে এবনরমাল হিসাবে কনসিডার করা হয়। এই সমাজে, সমলিঙ্গের দুটো মানুষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক কুরুচিকর, অশ্লীল কিন্তু সমপ্রেমের সো কল্ড অসুখ সারানোর জন্য ইলেকট্রিক শক টেকনিক, corrective rape গ্রহণযোগ্য। বাহ!

দিব্যা। (অধৈর্য হয়ে ঘাড় নাড়িয়ে) কী করলে মানুষ বুঝবে বলতো যে এই ধরণের যৌন অভিমুখ অস্বাভাবিক নয়? হাসি-ঠাট্টা-টিটকিরির বিষয় নয়? ভারতের সংবিধানের ৩৭৭ ধারায় তো সমপ্রেমকে decriminalize করা হয়েছে। Homosexuality যে অস্বাভাবিক নয়, প্রাণীজগতের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি যৌন প্রবৃত্তি সেকথা WHO declare করেছে তিরিশ বছরেরও বেশি হয়ে গেলো। কিন্তু নাহ। মানুষ তো কোনো যুক্তি মানবেনা, যা হয়ে এসেছে তার বাইরে কিছু দেখলেই রে রে করে উঠবে।

ঐশিকা আইনে যা স্বীকৃত সেটা সমাজে মান্যতা পেতে কয়েক যুগ লাগে। আমাদের এই সমাজে নিঃসন্দেহে এখনো কয়েক দশক লাগবে আরও। তবুও আমাদের দেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে এখানে অন্তত সমপ্রেমের অপরাধে Death penalty দেওয়া হয় না; যা আফ্রিকার বহু দেশে দেওয়া হয়।

দিব্যা আসলে আমাদের প্রতি মানুষের এহেন আচরণের মূল কারণ হলো অশিক্ষা। যারা মনে করে যে সমপ্রেম মানুষের খামখেয়ালি adventure বই আর কিছু না, তারা যদি জানতে পারে যে পৃথিবীতে প্রায় ১৫০০ টি প্রাণী প্রজাতির মধ্যেই homosexual acts পরিলক্ষিত হয় তাহলেও কি তারা রামধনু পতাকা জনসমক্ষে বুক চিতিয়ে জ্বালাতে পারবে?। শরীরের ত্রুটি সংশোধন করার জন্য নিজের সন্তানের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে!

ঐশিকা আমার মনে হয়না একবার বিশদে সবটা জানতে পারলে তারা আর এই সাহস দেখাবে। আমাদের পুরান, ভাস্কর্য, স্থাপত্যসহ নানা শিল্পকলাতে সমপ্রেমের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষ শিক্ষিত হতেই চায়না এসব ব্যাপারে, তারা তাদের গোঁড়ামিকে আশ্রয় করে চোখ কান বুজেই থাকতে চায়। যাতে যুক্তি-বুদ্ধি প্রবেশ না করতে পারে মস্তিষ্কে।

দিব্যা (একটু চুপ করে থেকে)। যেমন তোর দাদা, ঋষিকদা। (ঐশিকা চুপ করে থাকে।)

দিব্যা সরি ঐশিকা,। didn't mean to hurt you but, তোর দাদাও তো ঠিক একইভাবে আমাদের সাথে এতদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছিলো। নয় কি? আজ প্রায় আট বছর পরে, ঋষিকদা বুঝতে পেরেছে যে আমরা কোনো অপরাধ করি নি; ওদের বুঝতে ভুল হয়েছিল।

ঐশিকা মানুষ মাত্রেই তো ভুল হয়। যখন ওরা সে ভুল শুধরে নিতে চেয়েছে, আমাদেরও কি ক্ষমা করে দেওয়া উচিত নয়?

দিব্যা আমরা ক্ষমা করার কে?! বরং আমরাই এই সমাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। জানিস, আমার এখনো সেই দিনটা মনে পড়ে যেদিন আমি আর তুই একসাথে আমাদের সহজ সত্যিটা স্বীকার করেছিলাম বলে, তোকে তোর বাবা-মা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সেই দিনটাও মনে আছে যেদিন আমরা যখন দাদাকে খবর দিয়েছিলাম যে তোর কোলে বুবুই এসেছে, দাদা বলেছিলো বুবুই অপবিত্র, ঐ বাচ্চার বেঁচে থাকার থেকে...। কী দোষ ছিলো ঐশিকা আমাদের যে কেউ আমাদের ভালো চাইলো না?

ঐশিকা (কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর) আমারো কি কিছু মনে নেই? প্রতিটা অপমান মনে আছে। কত হাসিখুশি জীবন যাপন করতে পারতাম বল আমরা দুই পরিবার মিলে, ঠিক একটা স্বাভাবিক ম্যারিড কাপলের মতো। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে যে সেসব নেই। দশ-দশটা বছর চলে গেলো, পরিবারের কেউ তবুও কাছে টানলোনা। তাদের কাছে একটা মানুষ ভালোবেসে আরেকটা মানুষের হাত ধরাটা অপরাধ।

দিব্যা হ্যাঁ, আর নিজের শরীরের সহজ সত্যিটা স্বীকার করে নিয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকতে চাওয়াটা দুঃসাহস! সেদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছিলাম জানিস, জনসমক্ষে আমাদের কমিউনিটির ফ্ল্যাগ পোড়ানো হচ্ছে, পা দিয়ে দলা হচ্ছে। বলছিলো ওরা, এরকম বিকৃত হয়ে জন্মানোর থেকে নাকি না জন্মানো ভালো!

ঐশিকা পতাকা জ্বালালে জ্বালাক, ছাই হয়ে বেঁচে থাকবো আমরা; পা দিয়ে দললে দলুক, ধুলো মেখেই না হয় বিদ্রোহ করবো। আগের প্রজন্মের মহাপুরুষেরা অনেক কুপ্রথা রদ করে আমাদের জন্য একটা সুস্থ পৃথিবী রেখে গেছিলেন। আমাদেরও উচিত এইটুকু বিদ্রোহের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা।

দিব্যা একদম। এইটুকু করে যাওয়া আমাদের কর্তব্য, যাতে পরবর্তী প্রজন্মে সাতরঙা হয়ে কেউ জন্মালে তার কাছে পৃথিবীর জল-হাওয়া বিষাক্ত না লাগে। তাদের যেন আর ইলেকট্রিক শক নিয়ে বিষমকামি হয়ে ওঠার যন্ত্রণা না ভোগ করতে হয়!

(ঐশিকা দৃঢ় হয়ে ঘাড় নাড়ে। তখনই চকোলেট খেতে খেতে বুবুইয়ের প্রবেশ)

ঐশিকা ভাতটা নামানো বাকি আছে (হেসে) কেন, তোর বুঝি এর মধ্যে খিদে পেয়ে গেলো?

বুবুই না না। আমি চিকেনটা হয়েছে কিনা খোঁজ নিচ্ছিলাম, এটু টেস্ট করতাম। ঠিক আছে, হয়ে গেলে খবর দিও।

দিব্যা ওরে পাগলি আগে হাতের চকোলেটটা তো শেষ কর।

বুবুই উফফ মাপা তুমিও না ভারী বোকা। এইটুকু চকোলেটে কি পেট ভরে?

ঐশিকা আচ্ছা, আয়, আমার সাথে রান্নাঘরে আয় দেখি। চেখে বল কেমন হয়েছে।

(বুবুই আর ঐশিকা প্রস্থান করে মঞ্চের অন্যদিক দিয়ে। দিব্যা সোফায় বসে পুনরায় খবর কাগজ পড়তে শুরু করে ও পাতা ওল্টায় ধীরে ধীরে। হঠাৎ কলিংবেল বেজে ওঠে। দিব্যা খবর কাগজ রেখে চকিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকায়।)

দিব্যা (চেচিয়ে) ঐশিকা, দাদারা মনে হয় এসে গেছে।

(মঞ্চের আড়াল থেকে) ঐশিকা চেঁচিয়ে বলে,"দরজা টা একটু খুলে দে-এ-এ। আমি আসছি।" দিব্যা ঈষৎ ইতস্তত করে। তারপর উঠে মঞ্চের একপাশে দরজা খুলে দেওয়ার ভঙ্গি করে। একটি পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করে। পরনে শার্ট-প্যান্ট, হাতে মিষ্টির বাক্স ও চকোলেট। ইনি ঐশিকার দাদা, ঋষিক। দুজনে অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিক পর বলে,

দিব্যা এসো ঋষিকদা, ভিতরে এসো।

(ঋষিক মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।)

দিব্যা (সোফার দিকে নির্দেশ করে) আরে বসো না। দাঁড়িয়ে আছো কেন?

ঋষিক(হাতের মিষ্টির বাক্স ও চকোলেট দেখিয়ে ইতস্তত স্বরে) এগুলো কোথায় রাখবো?

(দিব্যা জিনিসগুলো নিয়ে টেবিলে রাখে। ঋষিক সোফায় বসে। দিব্যা দাঁড়িয়ে থাকে।)

ঋষিক কেমন আছিস তোরা?

দিব্যা বেশ আছি, তোমরা কেমন আছো? বৌদি দি এলো না কেন?

ঋষিক কাল সন্ধেয় হঠাৎ ছেলেটার জ্বর হলো, তাই ও আসতে পারলোনা রে। (ঈষৎ চুপ থেকে) আমার কিছু বলার আছে।

ঋষিক কাল সন্ধেয় হঠাৎ ছেলেটার জ্বর হলো, তাই ও আসতে পারলোনা রে। (ঈষৎ চুপ থেকে) আমার কিছু বলার আছে।

দিব্যা হ্যাঁ বলো না; এতো ইতস্তত করছো কেন?

ঋষিক ভুল বুঝে, ভুল জেনে দশ বছর তোদেরকে বঞ্চিত করে রাখলাম পরিবারের সান্নিধ্য পাওয়ার থেকে; কেন যে আমি..

দিব্যা আজ ওসব কথা থাক ঋষিকদা। তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরে আবার ঐশিকাকে সুযোগ দিয়েছ ওর পরিবারের সাথে reconcile করার, এই অনেক।

ঋষিক আমায় ক্ষমা করে দিস বোন, তখন রাগে অন্ধ ছিলাম আমি তাই বুবুইকে নিয়েও অনেক খারাপ খারাপ কথা....

দিব্যা ও হ্যাঁ, দাঁড়াও বুবুইকে ডাকি, সে তো তার মামাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে রয়েছে একেবারে। (চেঁচিয়ে) অ্যাই বুবুই... বুবুই।

(বুবুই মুখ মুছতে মুছতে প্রবেশ করে ধীর পদক্ষেপে। পিছনে ঐশিকা।)

ঋষিক (বাহু প্রসারিত করে) আয় বুবুই, আমার কাছে আয়।

(বুবুই গিয়ে ঋষিকের সামনে দাঁড়ায়।

ঋষিক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ পর বাহুমুক্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে ঐশিকার দিকে যায়। বুবুই দিব্যার কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ে।ঐশিকার দুহাত নিজের দুহাতে ধরে। ঐশিকার চোখে জল, মুখে হাসি। ঋষিকও আবেগমথিত। খানিক পর চোখ মুছে ঋষিক ঐশিকার এক হাত ধরে দিব্যার দিকেএগিয়ে যায়। দিব্যার আরেক হাত ধরে এবং দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলে,

ঋষিক বেঁচে থাকুক সব ভালোবাসা, তা সে সাদা কালো রঙের হোক বা রামধনু রঙের।

(বলে সে দিব্যার হাত ও ঐশিকার হাত মিলিয়ে দেয়। বুবুই কিছু না বুঝে হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে ওঠে। সব চরিত্র মুখে হাসি নিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকে। যবনিকা পতন হয়।)

সৃজন সঙ্গীদের পরিচিতি

উর্মিতা রায়
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

তিতলি সাহা
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

সুরভী ঘোষ
ইংরেজি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

রুকসানা খাতুন
ইতিহাস বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

অঙ্কনিকা সাধুখান
ইংরেজি বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

সমাদ্রিতা নন্দী
ইংরেজি বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

রূপা সাহা
দর্শন বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

শুভেচ্ছা মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

সৃজন সঙ্গীদের পরিচিতি

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

সৌভিক দাস
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

শ্রীমন্ত ভদ্র (শ্রী চন্দন কুমার বৈদ্য)
বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

শুভ সরকার , সায়নী কুণ্ডু
স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

লাবনী সরকার
স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

সুপ্রিয়া বারুই
স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

ঐন্দ্রিলা বসু
ইংরেজি বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

Internal Complaints Committee (ICC)

The "Sexual Harassment of Women a Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,2013" requires every workplace which has 10 or more employees to form an Internal Complaints Committee in order to prevent and redress any act of sexual harassment or discrimination against the women employees.The ICC is not only empowered to conduct investigations when an act of sexual harassment is reported in the workplace, but its recommendations regarding the punishment of the perpetrator(s) are also binding on the authorities of the workplace. Besides, the ICC is also responsible for spreading awareness regarding sexual harassment against women in order to prohibit such incidents and create a safe, non-discriminatory and conducive work environment for women employees.

In compliance with the rules framed under the POSH Act, 2013, the College has constituted the Internal Complaints Committee whose purpose is to prevent and prohibit sexual harassment of women employees and students and expedite the process of redressal in case such incidents take place in the workplace which would include both the college premises and any place visited by the aggrieved person for the purpose of official work related to the college.

Any of the actions listed below will be considered as sexual harassment and will come under the purview of the ICC:

1. Making sexually suggestive remarks, jokes or innuendos which are deemed unwelcome by the person at the receiving end

2. Serious or repeated offensive remarks, such as teasing related to a person's body or appearance.

3. Inappropriate questions, suggestions or remarks about a person's sex life.

4. Displaying sexually suggestive, pornographic materials or other offensive pictures, posters, mms, sms, whatsapp, or e-mails.

5. Intimidation, threats, blackmail around sexual favours.

6. Threats, intimidation or retaliation against a female employee who speaks up about unwelcome behaviour with sexual overtones.

7. Unwelcome social invitations, with sexual overtones commonly understood as flirting.

8. Unwelcome sexual advances which may or may not beaccompanied by promises or threats, explicit or implicit

9. Physical contact such as touching or pinching. Caressing, kissing or fondling someone against her will (could be considered assault).

10. Invasion of personal space (getting too close for no reason,brushing against or cornering someone).

11. Abuse of authority or power to threaten a person's job or undermine her performance against sexual favours.

Complaints to be lodged within three months of the incident of sexual harassment.

Written complaints may be dropped into designated complaint box located in the college main building.

Complaints may also be emailed to internalcomplaints@bgc.ac.in
The members of the ICC may be contacted for any assistance in lodging complaints. The contact details of the members are available on the college website www.bgc.ac.in.

Strict confidentiality will be maintained regarding the identity of the aggrieved person
Note – False and malicious complaints will be punishable as per existing rules

Gender Sensitization Committee: Its Mission and Vision

Gender and sexuality, among many other things, play an important role in shaping an individual's perception of the world vis a vis themselves and define who they are. While gender and sexuality have always had various expressions, patriarchy has helped to uphold only the heterosexual male perspective as normative, marginalizing the other genders and sexualities in the process. Though the long feminist struggle for women's equality and the more recent movements for the rights of LGBTQIA+ people have sought to dismantle patriarchy, it continues to hold sway over our society and culture.

Since our college primarily caters to a semi-urban and rural population, most of the students who come to study here are unaware of these issues which still remain largely confined among the metropolitan elite. The Gender Sensitization Committee of the college aims to address this gap. It strives to make the students aware of the complex workings of patriarchal culture which not only oppresses women and trans or non-heterosexual men, but also heterosexual cis-men by upholding toxic standards of masculine behaviour. It aims to inspire them to question their patriarchal conditioning, realize the constructed nature of gender identity, and thereby accept the diverse expressions of gender and sexuality as equally valid and normal.

The committee regularly organizes sensitization workshops, cultural programmes, poster campaigns and so on, both at the departmental and college level in order to raise awareness and inculcate an empathetic and egalitarian outlook among the students. Besides conducting these programmes the committee is also responsible for addressing any case of sexual harassment faced by the male students who do not fall under the purview of the ICC. Thus, it works hand in hand with the ICC to create a safe campus where everyone irrespective of their gender and sexual identity feels seen, heard and free to be who they are.

Swar, the e-magazine is our newest endeavour in this direction. It seeks to provide a platform for our students to voice their thoughts on gender and their gendered experience of everyday life. It thus aims to facilitate an exchange of ideas among the students and provoke further dialogue. The enthusiastic response that we have received from the students so far makes us hope that our endeavour will not be futile.

Convener
Gender Sensitization Committee

Swar, the e-magazine is our newest endeavour in this direction. It seeks to provide a platform for our students to voice their thoughts on gender and their gendered experience of everyday life. It thus aims to facilitate an exchange of ideas among the students and provoke further dialogue. The enthusiastic response that we have received from the students so far makes us hope that our endeavour will not be futile.

PUBLISHED BY

ICC & GENDER SENSITIZATION COMMITTEE

BARASAT GOVERNMENT COLLEGE